'পথের দাবী'র শেষ কথা

শ্রীরঘুনন্দন দাস

কলিকাতা
অমিয় লাইব্রেরী
১৯, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, শ্যামবাজার

প্রকাশক—শ্রীরমানাথ মিত্র
অমিয় লাইব্রেরী
১৯, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, শ্যামবাজার
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—৬ঠা এপ্রিল, ১৯৪৭

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেস
পণ্ডিচেরী

উৎসর্গ

সব্যসাচীর ন্যায় অদ্ভুত চরিত্রের স্রষ্টা
বাংলার স্বনামধন্য দরদী সাহিত্যিক
স্বর্গীয়
শরৎচন্দ্রের অমর আত্মার উদ্দেশে
আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি
পরম শ্রদ্ধা ভরে
উৎসর্গ করিলাম।

রঘুনন্দন

"পথের দাবী"র শেষ-কথা

১

ডাক্তারের প্রস্থানে সুমিত্রা অত্যধিক অভিভূতা হইলেও, তাহার অকস্মাৎলব্ধ বিপুল ধন-সম্পত্তির একটা বিধি-ব্যবস্থা করিবার জন্য পরের দিনই তাহাকে সুরাবায়া রওয়ানা হইতে হইল।

যাইবার সময় সুমিত্রা ভারতীর দুইখানি হাত ধরিয়া অতি শান্ত এবং বেদনার সুরে বলিল,—"বোন্, একদিন কর্তব্যের কঠিন শাসনের খাতিরে আমি আমার নিজের অন্তরকে বঞ্চনা ক'রে, তোমার" উপর সত্যিই অবিচার করেছিলাম। কিন্তু আমাদের মতো অদূরদর্শী বিচারকের মাথার উপরে যে একজন অন্তরদর্শী বিচারক আছেন, তোমার প্রতি তাঁর বিধান যে অন্যরূপ স্থির হ'য়ে আছে, সে-সত্য তলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা তখন একমাত্র ডাক্তার ভিন্ন আর কারো ছিল না।...ভারতি! আমায় আজ তুমি ক্ষমা করো বোন্,—আমি ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি, তুমি তোমার জীবনে নিশ্চয়ই সুখী হবে। কিন্তু আজ আমি একটা কর্তব্যভার তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, ভারতী, সারাজীবন তোমাকে সে-ভার বইতে হবে,—অশিক্ষিতদের যে শিক্ষার ব্রত আমরা গ্রহণ করেছি, সে-ব্রত তুমি ত্যাগ কোরো-না। আমার অবর্তমানে এর সব দায়িত্ব আমি তোমার উপর দিয়ে গেলাম। আমি সব-সময়েই তোমাদের পিছনে আছি,—প্রয়োজন ম'ত সব সাহায্যই তোমরা আমার কাছে পাবে।"

বিদায়ক্ষণে সুমিত্রার এইরূপ কোমল এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণে ভারতীর অন্তর বিগলিত হইল। যাহার বর্তমানে সে নিজেকে সকল বিষয়ে নিরাপদ মনে করিত, তাহার সেই ডাক্তার-দাদা তাহাদের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কয়েক-মুহূর্ত মধ্যে সুমিত্রা-দিদিও চক্ষুর অন্তরাল হইবেন। নিঃসহায় এবং নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ভারতীর দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সুমিত্রা স্নেহভরে ভারতীর মস্তক নিজের বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া বলিল,—"দুঃখ কোরো না বোন, সত্যকারের অপূর্ববাবুকে চিনবার শক্তি তখন আমার হয়নি। আমি স্থির জানি—অপূর্ববাবু তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় সাথী হয়ে একদিন তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন, তোমার কাজের নির্ভীক সহায়রূপে তুমি তাঁকে পাবে। আমি সুরাবায়ায় পৌঁছে তোমাকে সংবাদ দিব।" এই বলিয়া সুমিত্রা ভারতীর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল। ভাড়াটিয়া গাড়ী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, গাড়ীতে উঠিয়া সুমিত্রা গলা বাড়াইয়া ভারতীকে বলিল,—অপূর্বর জন্য একখানা চিঠি লিখিয়া টেবিলের ড্রয়ারে রাখিয়া দিয়াছে, অপূর্ববাবু বাসায় ফিরিলে ভারতী যেন মনে করিয়া চিঠিখানা তাঁহাকে দেয়।

সুমিত্রাকে লইয়া ভাড়াটিয়া গাড়ী দ্রুত অগ্রসর হইল। ভারতী নির্বাক শান্তভাবে দাঁড়াইয়া, যতদূর দৃষ্টি গেল, গাড়ীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

* * *

এদিকে ব্রজেন্দ্র হাটা-পথে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া কোথাও সব্যসাচীর সন্ধান না-পাওয়ায়, জাহাজযোগে সিঙ্গাপুরে আসিয়াছে এবং একটি দল-পাকাইয়া কোন-এক নিভৃতস্থানে অবস্থান করিতেছে।

* * *

সিঙ্গাপুরে জেনারেল পোষ্ট অফিসের সম্মুখে একটা বড় রেষ্টুরেণ্ট আছে। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য মাঝে-মধ্যে ডাক্তারকে এই রেষ্টুরেণ্টে আসিতে হইত, তাহা ব্রজেন্দ্রের জানা ছিল।

* * *

মুখে চোঁচালো-চোচালো লম্বা গোঁফ-ওয়ালা একটি প্রৌঢ় চীনাম্যান্ একটি চুবড়িতে করিয়া কতকগুলি কাগজের খেলনা লইয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় উক্ত রেষ্টুরেণ্টের সংলগ্ন পানের দোকানের সম্মুখে আসিয়া বসে। লোকটির খেলনা বিক্রয়ের প্রতি যত বেশী নজর না-থাকুক তদপেক্ষা বেশী নজর—রেষ্টুরেণ্টে যাতায়াতকারী লোকজনের উপর।

একদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে এমন সময় রেষ্টুরেণ্টের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিল। তাহার মুখে প্রচুর দাড়ি-গোঁফ, পরণে পায়জামা, গায়ে লম্বা একটি কোট, গলায় কম্ফর্টার জড়ান এবং মাথায় একটি টার্কিস্ ক্যাপ; শরীরের গঠন বেশ মোটা-সোটা। লোকটিকে দেখিয়া ভারতীয় মুসলমান ব্যবসায়ী বলিয়া মনে হয়।

উক্ত ব্যক্তি রেষ্টুরেণ্টের বাহিরের সিঁড়ি অতিক্রম করিতেই, সেই প্রৌঢ় চীনাম্যানটির দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। মুহূর্তমাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি খেলনার চুবড়িটি ঢাকা দিয়া, পানওয়ালার জিম্মায় রাখিয়া চীনাম্যান সেই মুসলমান ব্যক্তিটিকে অনুসরণ করিল। যাইবার সময় তাহার তামাকু খাইবার দীর্ঘনলযুক্ত হুকাঁটি হাতে করিয়া লইয়া চলিল।

চীনাম্যান যাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল, সেই মুসলমান ব্যক্তিটি মনে কি-একটা বিষয়ের গভীর চিন্তা লইয়া, কতকটা অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে আরম্ভ করিল; বড় রাস্তার মোড় ছাড়াইয়া দক্ষিণে একটি অপ্রশস্ত

রাস্তা ধরিয়া সে আগাইয়া চলিল। সম্মুখে একটি চীনা-পল্লী, পল্লীর শেষ প্রান্তে একটি বিস্তৃত ডোবা, ডোবাটির অপর পার্শ্বে কাষ্ঠ-নির্মিত একটি পুরাতন দ্বিতল গৃহ। রাস্তার ধার হইতেই দ্বিতলে উঠিবার একটি সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতলে একটি বারান্দা ব্যতীত পর-পর তিনটি কুঠুরী আছে; মাঝের কুঠুরিটি অপেক্ষাকৃত বড়। এই বড় কুঠুরীর ভিতর মেঝের উপর একটি গালিচাতে বসিয়া চারিজন লোক তাস খেলায় মত্ত আছে।··· সেই মুসলমান ব্যক্তিটি সমস্ত রাস্তা অতিক্রম করিয়া আসিয়া, উক্ত গৃহের সিঁড়ি বাহিয়া, সেইরূপ অন্যমনস্ক ভাবেই ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল। কিন্তু, আজ সে প্রতিদিনের অভ্যাসমত সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গেল।---বড় কক্ষটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মাথার টুপিটি খুলিয়া রাখিয়া একটি চেয়ারে বসিতে যাইবে, এমন সময় সে শুনিতে পাইল, কে যেন পিছন হইতে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিতেছে—"ব্রজেন্দ্র, বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও।"·· ব্রজেন্দ্র পকেটে হাত পুরিবার অবসর পাইল না, মুহূর্তমধ্যে মস্তকে গুলির আঘাতে ধরাশায়ী হইল। তাসখেলায় রত চারি ব্যক্তি অকস্মাৎ রিভলভারের শব্দে সচেতন হইয়া ব্রজেন্দ্রের সাহায্যে অগ্রসর হইতেই, পর-পর তিন ব্যক্তি ব্রজেন্দ্রের দশা প্রাপ্ত হইল এবং বাকী একজন জানালা দিয়া লাফাইয়া ডোবায় পতিত হইল। পিস্তলের শব্দ শুনিয়া পাশের কুঠুরী হইতে এক ব্যক্তি অতি দ্রুত বাহির হইয়া আসিয়া, ব্রজেন্দ্রের আততায়ীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িতে যাইবে, এমন সময় অজ্ঞাত কোন এক ব্যক্তির গুলির আঘাতে তাহার পিস্তলটি হস্তচ্যুত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত ব্যক্তিটি আনন্দে লাফাইয়া উঠিল—"থ্যাঙ্ক গড্, মাই মাষ্টার ইজ্ সেভ্ড্ টু-ডে!"

পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, প্রৌঢ় চীনাম্যানটি আর কেহ নহে,

ইনি ছদ্মবেশধারী আমাদের 'সব্যসাচী' এবং তাঁহার জীবনরক্ষাকারী অজ্ঞাত ব্যক্তিটি রেষ্টুরেণ্টের নবনিযুক্ত দরোয়ান, আমাদের 'হীরাসীং'।

হীরাসিং এর এইরূপ অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক আবির্ভাবে, সব্যসাচী একটু বিস্মিত হইলেন। হীরাসিং ব্যস্তভাবে বলিল—"লেট্ আস্ বি অফ্।" মুহূর্তমধ্যে উভয়ে নীচে নামিয়া বাহিরের গাঢ় অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

রেঙ্গুন হইতে সেই দুর্যোগপূর্ণ গভীর রাত্রে 'পথের দাবী'র সভ্যদের নিকট বিদায় লইয়া, সব্যসাচী নৌকা বাহিয়া তাহার জন্য নির্দিষ্ট জাহাজে আসিয়া উঠিয়াছিল। হীরাসিং তাহার মাষ্টারের সিঙ্গাপুর যাত্রার উদ্দেশ্য পূর্ব হইতেই টের পাইয়াছিল। সিঙ্গাপুরে ডাক্তারের জীবন একা সঙ্কটাপন্ন ভাবিয়া সে পোষ্ট অফিসে দরখাস্ত করিয়া একমাসের ছুটি লইয়াছিল এবং ডাক্তারের অগোচরে একই জাহাজে নিজের জন্যও একটি আসন সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল।

ডাক্তারকে অনুসরণ করিয়া সিঙ্গাপুরে আসিয়া হীরাসিং সর্বদার জন্য ডাক্তারের গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল। চীনা-ছদ্মবেশ ধারণে ডাক্তারের দক্ষতা সম্বন্ধে হীরাসিংএর জানা ছিল এবং বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত ডাক্তার যে প্রত্যহ একই স্থানে একই সময়ে দেখা দেন না, তাহাও হীরাসিং জানিত। সুতরাং ডাক্তারকে একাদিক্রমে দুই তিন দিন সন্ধ্যার সময় খেলনা লইয়া রেষ্টুরেণ্টের পাশে বসিতে দেখিয়া, হীরাসিং তাহার যুদ্ধকালীন প্রশংসাপত্রের বলে, রেষ্টুরেণ্টের মালিকের নিকট হইতে দরোয়ানের চাকুরিটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। ইহার পরের ঘটনা পাঠক সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সেইদিন হীরাসিং ডাক্তারকে অনুসরণ করিয়া দ্রুত ব্রজেন্দ্রের

আড্ডায় উপস্থিত হইতে না পারিলে, মুহূর্ত পরে সব্যসাচীর যে কি পরিণতি হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সব্যসাচীর এইরূপ মৃত্যু ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। ভগবান তাঁহার কোন্ মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সব্যসাচীকে জগতে পাঠাইয়াছেন তাহা একমাত্র তিনিই জানেন।

২

কয়েকদিন গত হইল, বিনোদবাবুর পরিচিত একটি যুবক কলিকাতায় আসিয়া বিনোদবাবুদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে। যুবকটির অতীত-দিনের ইতিহাস সংক্ষেপে নিম্নলিখিতরূপ।

বিনোদবাবুর পিতা মফঃস্বলের কোনও এক স্থানে যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় এই যুবকটির সহিত বিনোদবাবুর পরিচয় হইয়াছিল। যুবকটির নাম রাজীবলোচন গোস্বামী—রংটা একটু ফর্সা, দেখিতেও বেশ সুশ্রী এবং তাহার চোখে-মুখে বেশ একটা দৃঢ়তার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। রাজীবলোচনের বাল্যকাল হইতে সমগ্র কৈশোর জীবন গোস্বামী-পরিবারের সকল প্রকার হিঁদুয়ানী সংস্কারের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে-সংস্কার সংসারের অপর পাঁচজনের ন্যায় রাজীবের অন্তরে শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। হিন্দু-আচার-নীতির প্রথা অনুযায়ী সকল বিধি-নিষেধ সে কতকটা উদাসীনভাবেই মানিয়া চলিত মাত্র। এই সব খুঁটিনাটি নিয়ম মানিয়া চলার পিছনে প্রকৃতই কোন সত্য আছে কি না, তাহা সে ভাবিয়া পাইত না। তাহাদের গ্রামের এক ভদ্র মুসলমান পরিবারের একটি ছেলের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল, রাজীব তাহাদের বাড়ীতে দেখিয়াছে—পরিষ্কার চাদর বিছাইয়া তাহার উপর থালা রাখিয়া তাহারা ভাত খায়, এঁটো বলিয়া কোন সংস্কার তাহাদের মনের ভিতর নাই; সম্ভবমত সকল বিষয়ে তাহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও থাকে এবং তাহাদের সংসারে আর্থিক সচ্ছলতাও বেশ আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রাজীব তাহার নিজের সংসারে দেখিয়াছে—

সকলেই নানা আচার-বিচার মানিয়া চলে, সকল বিষয়ে কত শুচিতা রক্ষা করিয়া পা বাড়ায় এবং মালক্ষ্মীর পূজাও মাঝে-মধ্যে করা হয়। কিন্তু এত করা সত্ত্বেও, তাহাদের সংসারে আর্থিক অসচ্ছলতা যেন দিন-দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সংসারের এইরূপ আর্থিক অনটনের দরুণ, গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিয়াই রাজীবকে তাহার পাঠ সাঙ্গ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যার্জনের প্রতি তাহার অন্তরের একান্ত আগ্রহকে সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই; বিশেষ করিয়া ইংরাজী ভাষাটা একটু ভাল করিয়া শিখিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়, রাজীব তাহার সহপাঠি—গ্রামের জমিদার-পুত্রের সুপারিশে বিনোদবাবুর সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহার নিকট ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

রাজীবের স্বভাব বেশ বিনয়নম্র। প্রয়োজন ম'ত সকলের সাথেই সে মেলামেশা করিতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার যুক্তি-তর্কে যদি কোনও বিষয় তাহার নিকট অন্যায় বা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিতেও সে দ্বিধা বোধ করে না। বিনোদবাবু রাজীবের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যহ অবসর ম'ত রাজীবকে ইংরাজী শিক্ষায় সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

বিনোদবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া রাজীব দেখিয়াছিল—তাঁহাদের আচার ব্যবহার এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, তাহাদের নিজেদের সংসার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—টেবিলের উপর সাদা ধপ্‌ধপে কাপড় বিছাইয়া তাঁহারা ভাত খাইতেন। ব্রাহ্মণ-পরিবারকে ঐরূপভাবে চেয়ার-টেবিলে আহার করিতে রাজীব তাহার জীবনে সেই প্রথম দেখিয়াছিল। বিনোদবাবু-দের রীতি-নীতি রাজীবের হিন্দু সংস্কারকে একটু স্পর্শ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে সে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয় নাই। রাজীবের চরিত্রের

একটা বিশেষত্ব এই যে, সে যে-কোন অবস্থায় নিজেকে সাধ্যমত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে।

বিনোদবাবুর নিমন্ত্রণে প্রথম যেদিন রাজীব বিনোদবাবুদের বাড়ীতে খাইতে গিয়াছিল—টেবিল-চেয়ারে ভাত খাওয়ার ব্যাপারে অনভ্যস্ততার জন্য প্রথমটা তাহার একটু অসুবিধা হইলেও পরক্ষণেই সে নিজেকে মানানসই করিয়া লইয়াছিল। কেবলমাত্র বিনোদবাবুর প্রতি চাহিয়া রাজীব প্রশ্ন করিয়াছিল—"আপনারা বোধ হয় এঁটো বিচার করেন না?"

রাজীবের সেই প্রশ্নে বিনোদবাবুর খেয়াল হইয়াছিল—রাজীব গ্রাম্য হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, সুতরাং তাহার জন্য পৃথক আহারের ব্যবস্থা করিলেই ভাল হইত। এবং সে-বিষয়ে রাজীবকে বিনোদবাবু জিজ্ঞাসা করিলে, রাজীব বলিয়াছিল—তাঁহাদের সহিত বসিয়া ঐরূপভাবে আহার করিতে তাহার কোনই অসুবিধা হইবে না, সুতরাং আহারের পৃথক ব্যবস্থা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

আহার করিতে করিতে বিনোদবাবু রাজীবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"আচ্ছা, রাজীব, আমাদের সঙ্গে এরকমভাবে একসঙ্গে বসে তোমার খাওয়ার কথা যদি তোমার মা জানতে পারেন তবে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না?"

বিনোদবাবুর সেই প্রশ্নে রাজীব অতি সরল এবং পরিষ্কার ভাবে উত্তর করিয়াছিল—"মা যদি এইসব অতি তুচ্ছ ব্যাপারের জন্য ক্ষুণ্ণ হন বা দুঃখ করেন, তবে সেজন্য দায়ী আমি নই, দায়ী তাঁদের বুঝবার ভুল,—তাঁদের মনে কোন দুঃখ দেওয়া তো আমার মোটেই ইচ্ছে নয়, বরং তাঁদের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধাকে সব-সময়ের জন্য আমি অটুট রেখে

চ'লতে চাই। তাই ব'লে তাঁদের ভুল বুঝার দরুণ যে-সব বিধি-নিষেধ এবং আচার-নীতির পিছনে সত্যকারের কোন যুক্তিই নেই, সে-সবকে আঁকড়ে ধ'রে নিজের মন-প্রাণ-চিত্তকে পঙ্গু ক'রে রাখতে আমি কিছুতেই রাজি হ'তে পারি না। গোবর-জল দিয়ে ভাতের এঁটো শুদ্ধ করার পিছনে হয় তো কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকতে পারে, তাই ব'লে গোবর অভাবে বিন্দুমাত্র শুক্‌নো ঘুঁটে ঘ'সে মনের খুঁত মেটান একটা হাসির ব্যাপার নয় কি?—এই দেখুন-না, হিন্দু-আচারে মাদুরে ব'সে শুক্‌নো মুড়ি খাওয়াটা কোন রকমে চালানো যেতে পারে, কিন্তু সেই মুড়িতে যদি দু'চার ফোঁটা জল পড়ে তবে মাদুরখানা ধুয়ে না-ফেললে আর হিন্দুত্ব বজায় থাকে না।...এটা বেশ বুঝি—মাটির মেঝে গোবরজল দিয়ে নিকোলে তা' ভালই দেখায়, কিন্তু সিমেণ্ট করা মেঝেতে ফিনাইলের বদলে গোবর ঘ'সে মনের এঁটো সংস্কার তৃপ্তি পায় বটে, কিন্তু তাতে মেঝেটা পরিষ্কার না হ'য়ে আরও নোংড়াই হয়। ঠিক নয় কি?"

রাজীবের সেদিনকার উক্তরূপ সমালোচনায় বিনোদবাবু হাসি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। রাজীব আরও বলিয়াছিল—"মানুষ যদি কালের পরিবর্তনের সাথে আচার-নীতিরও একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চ'লতে না পারে এবং পুরোনো সব সংস্কারের মায়া কাটাতে অনিচ্ছুক হয়, তবে সে নিজেকে সঙ্কীর্ণই ক'রে রাখে, সংসারের অপর পাঁচজনের সাথে মিলে-মিশে চলা তার পক্ষে কষ্টকর হয়। কিন্তু সেজন্য দায়ী সে নিজেই।"

বিনোদবাবু রাজীবের নিকট উক্তরূপ সব যুক্তিপূর্ণ মতামত শুনিয়া একটু আশ্চর্য হইয়াছিলেন, কারণ গ্রাম্য ব্যক্তিরা আধুনিক আচার-নীতিকে ঘৃণাই করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া রাজীবের ন্যায় গোস্বামী-পরিবারের

একটি যুবকের নিকট তিনি ঐরূপ মতামত আশা করেন নাই। সেইদিন হইতে বিনোদবাবু রাজীবকে বেশ একটু স্নেহের চক্ষেই দেখিতেন এবং সাধ্যমত তাহাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিতেন।

একটি ঘটনা রাজীবের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং তাহা এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছি।

রাজীবদের গ্রামের জমীদার-গৃহের অন্তঃপুরের একটি কক্ষে দুইটি কিশোরী (ঠিক কিশোরী বলা চলে না—সবে যৌবনের প্রথম ধাপে পা দিয়াছে) সেলাইয়ের ছুঁচ-সূতা লইয়া কার্পেট বোনায় রত আছে। একটি জমীদার কন্যা, নাম 'অরুণা,' অপরটি অরুণাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে 'প্রতিভা'। কার্পেটের ঘর গুনিয়া সেলাই করিতে করিতে একটি ঘরের সেলাই শেষ করিয়া প্রতিভা অরুণার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ-রে অরুণা, রাজীবদা'কে আর তোদের বাড়ীতে আসতে দেখিনা, কেন রে?"

অরুণা বলিল,—"কেন, তা' কি করে বলবো ভাই?"

প্রতিভা পুনরায় প্রশ্ন করিল—"কতদিন হ'তে আসে না?"—

অরুণা আঙুল গুনিয়া বলিল—"গত রবিবারে আট দিন গিয়েছে,—সোম, মঙ্গল, বুধ—এই ঠিক চার মাস এগার দিন হ'ল।"

আঙুল-গুনা শেষ করিয়া, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া, অরুণা হেঁট-মুখে সেলাইয়ে মন দিল। কিন্তু সেদিন কিছুতেই তাহার সেলাইয়ে মন বসিল না, অতীত দিনের কত স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—অরুণার অনুরোধে কতদিন রাজীব তাহাদের উঠানের চাঁপা-ফুলের গাছে চড়িয়া অরুণাকে ফুল পাড়িয়া দিত; উপর হইতে ফুল ফেলিয়া দিয়া অরুণাকে আঁচল পাতিয়া ধরিতে বলিলে, অরুণা যখন ঠিক ধরিতে পারিত

না, তখন রাজীব গাছের উপর হইতে বলিত—"হাঁদা মেয়ে, কেবল খেতেই জানো ?" অরুণা যখন আরও ছোট ছিল, তখন সে রাজীবের কাছে ফার্ষ্ট-বুকের মানে জিজ্ঞাসা করিয়া লইত—'ফ্রগ' মানে 'বেঙ', কিন্তু অরুণা 'ফ্রগ' উচ্চারণ না করিয়া 'ফ্রক্' বলিত। রাজীব বলিত—'ফ্রগ'কে যদি 'ফ্রক' বল্‌বে তা' হ'লে তুমি যখন 'ফ্রক' প'রবে, আমি তোমাকে 'ফ্রগ' ব'লে ডাক্‌বো।" এই বলিয়া রাজীব খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিত। রাজীবের সেই হাসি অরুণার কানে যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল; তাহার প্রত্যেক ভাবভঙ্গী, চলা-ফেরা সমস্তই সেদিন অরুণার সম্মুখে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

জমীদার-পুত্র সৌরীনের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বাল্যকাল হইতে রাজীব সৌরীনদের বাড়ী যাতায়াত করিত। কাজেই অরুণা রাজীবকে তাহার অতি শৈশবকাল হইতেই জানে। রাজীবের সহিত দীর্ঘ দিনের মেলা-মেশায় রাজীব অরুণার সমগ্র অন্তরটিকে তাহার অজ্ঞাতে কবে কি করিয়া যে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহা অরুণা টের পায় নাই। অরুণার পিতার নিষেধে যেদিন হইতে রাজীব তাহাদের বাড়ী আসা বন্ধ করিল, সেদিন হইতে অরুণা বুঝিল—রাজীবের প্রতি তাহার মন কত আগ্রহশীল!

একদিন রাত্রে অরুণা শুনিল—পাশের ঘরে তাহার বাবা তাহার মাতাঠাকুরাণীকে বলিতেছে—"রাজীব স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দিয়ে, গাঁজা মদের দোকানে পিকেটিং ক'রছে আর এখানে-সেখানে মিটিং ক'রে বড় হৈ-চৈ ক'রে বেড়াচ্ছে; সে-জন্যে ওর ওপর পুলিশের নজর পড়েছে। সুতরাং, রাজীব আর আমাদের বাড়ী যাতায়াত করুক, তা' আমি চাই না, সৌদামিনী, তা' ছাড়া, অরুণাও এখন একটু বড় হ'য়েছে, রাজীবের সঙ্গে অরুণার মেলা-মেশাটাও আর তেমন ভাল দেখায় না। তুমি রাজীবকে নিষেধ ক'রে দিও সে-যেন আমাদের বাড়ীতে আর না-আসে।"…এই

কথা শুনিয়া অরুণা চমকিয়া উঠিল, কেমন যেন এক অজ্ঞাত বেদনায় অশ্রুভারে তাহার চোখ দুটি ঝাপ্সা হইয়া আসিল।

সেদিন রাত্রে অরুণার আর কিছুতেই ঘুম আসিল না—রাজীবের সম্বন্ধে নানা চিন্তা, নানা ঘটনা-স্মৃতি তাহার মনের মাঝে জাগিয়া উঠিল। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অরুণার সমগ্র কৈশোর জীবন রাজীবের সাথে সাথে কাটিয়াছে ; খেলা-ধুলায় এবং পড়াশুনায় রাজীবই ছিল তাহার একমাত্র উৎসাহদাতা এবং শিক্ষক। ছোরাখেলা লাঠিখেলা হইতে আরম্ভ করিয়া, এমনকি ঘোড়ায় চড়া অবধি সে রাজীবের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। একবার একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অরুণা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার সেই কৃতিত্বে রাজীবের সেদিন কী আনন্দ।···আর একদিনের একটি ঘটনা অরুণার মনে পড়িয়া গেল—অরুণার বয়স তখন নয়-দশ বৎসর হইবে। রাজীব মাঝে মাঝে অরুণাকে তাহার পিছনে বসাইয়া ঘোড়া ছুটাইত, কখনও আবার অরুণাকে একা ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া দিয়া, ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া কিছুদূর তাহাকে ঘুরাইয়া লইয়া আসিত। সেদিন অরুণা রাজীবকে বলিল—"রাজীবদা, লাগামটা আমার হাতে ছেড়ে দাও না, আমি নিজেই ঘোড়া ছোটাতে পারব।" রাজীব প্রথমে সম্মত হয় নাই, কিন্তু অরুণা জিদ ধরিয়া বসায়, রাজীব ঘোড়ার লাগামটি তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—"এই নাও, দেখি কেমন ছোটাতে পার।"

অরুণা ঘোড়ার লাগামটা ঠিকমত ধরিয়া, পায়ের গোড়ালী দিয়া পাঁজরায় ঘা মারিতেই ঘোড়া তাহাকে লইয়া ছুটিল। রাজীব চাহিয়া দেখিল—কী আশ্চর্য, অরুণা ঠিক একটি পাকা ঘোড়-সওয়ারের মতই ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে !—মাঠের চারিদিক ঘুরিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া অরুণা রাজীবের সম্মুখে ঘোড়া থামাইল। সেদিন রাজীব তাহার পিঠ চাপড়াইয়া

বলিয়াছিল—"বাঃ, সাবাস !—তুমি হবে ঝাঁসীর রাণীর মতো, কি বল ?" রাজীবের সেই কথাগুলি অরুণার বালিকা-হৃদয়ে কত স্বপ্নই সৃষ্টি করিয়াছিল।

সৌদামিনী তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তাঁহার স্বামীর প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়া, একদিন রাজীবকে তাঁহার স্বামীর আদেশ জানাইতে বাধ্য হইলেন। সৌদামিনী রাজীবকে বুঝাইয়া বলিলেন—"বাবা, এতে তুমি যেন মনে দুঃখ কোরো না—জান তো, বাবা, গবর্ণমেণ্টকে আমাদের একটু সন্তুষ্ট রেখেই চ'লতে হয়। আমাদের বাড়ীতে তোমার যাতায়াতের জন্য যদি তোমার খুড়োম'শায়ের ওপর গবর্ণমেণ্টের নজর পড়ে, তা' হ'লে আমাদের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে, রাজীব !"

রাজীব তাহার খুড়ীমার সস্নেহ ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—"না, খুড়ীমা, এতে আর দুঃখ কি ? আমার জন্য আপনাদের কোনো ক্ষতি হোক্, তা' আমি চাইব কেন ? তা' ছাড়া আজ-কাল সভা-সমিতি আর পিকেটিং নিয়ে আমাকে প্রায় সব-সময়েরই জন্যই ব্যস্ত থাকতে হয়—আমার সময় কৈ ?"

রাজীবের কথায় সৌদামিনীর মন হইতে যেন একটা বোঝা সরিয়া গেল। তিনি রাজীবকে বলিলেন, "স্বদেশী-হাঙ্গামার মধ্যে তুমি আর থেকো না, বাবা— ও-সব ছেড়ে দাও।"

রাজীব তাহার খুড়ীমার এইরূপ উপদেশে একটু মৃদু হাসিল মাত্র।

পূর্বোক্ত ঘটনার পর প্রায় ছয় মাস অতীত হইয়াছে। রাজীব তাহার নিজের চেষ্টায়, তাহাদের গ্রামে নিরক্ষর বয়স্ক-লোকদিগের প্রাথমিক-শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। রাজীবের নানা বিষয়ে দক্ষতার বিষয় ক্রমশঃ বিভিন্ন গ্রামে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিকটবর্তী গ্রামের একটি যুবসঙ্ঘের আমন্ত্রণে, প্রায় চার-পাঁচ দিন গত হইল, রাজীব

সেখানে গিয়াছে। গ্রামের যুবকগণ রাজীবকে ধরিয়া বসিয়াছে—তাহাদের গ্রামেও একটি নৈশ-বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়া দিয়া তবে তিনি যাইতে পারিবেন।

সেদিন রবিবার, সঙ্ঘের যুবকেরা রাজীবের সভাপতিত্বে বৈকালে তাহাদের গ্রামে এক সভা আহ্বান করিয়াছে। রাজীব নিরক্ষর লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বেশ সরল ভাষায় বুঝাইয়া বলিতেছে। রাজীবের বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হইয়া, সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই প্রস্তাবিত নৈশ-বিদ্যালয়ের পড়ুয়ার তালিকায় নাম লিখাইয়া দিল।

সভাভঙ্গের পর রাজীব তাহার এক সহকর্মীর সহিত বাসায় ফিরিতেছে এমন সময় পথিমধ্যে তাহাদের গ্রামের জমীদার-বাটীর এক পেয়াদা রাজীবের হস্তে একটী পত্র প্রদান করিল। পেয়াদাকে দেখিয়া রাজীব জিজ্ঞাসা করিল—"কি নিতাই, তুমি এখানে ?"

পেয়াদাটি বলিল—"গিন্নী-মা এই চিঠিখানা দিয়ে আজ সকালে আমাকে আপনাদের বাড়ী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ীতে আপনার দেখা না-পেয়ে, আপনার খোঁজে আমাকে আবার এখানে আসতে হ'ল। আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্য গিন্নী-মা আমাকে বার-বার ব'লে দিয়েছেন। চিঠিখানা পড়ুন, তা হ'লেই সব বুঝতে পারবেন।"

রাজীব চিঠি খুলিয়া পড়িল—জমীদার-পত্নী সৌদামিনী রাজীবকে লিখিয়াছেন—"বাবা রাজীব, আগে-হ'তে তোমাকে কোনো খবর দিতে পারিনি,—মহেশপুরে হঠাৎ অরুণার বিয়ে ঠিক হ'য়ে গিয়েছে—আগামী কাল বিয়ে। এবিয়েতে তোমাকে আসতেই হবে, রাজীব,—এ তোমার খুড়ীমার আদেশ এবং অনুরোধ, দু-ই জানবে।"

এইরূপ সংবাদের জন্য রাজীবলোচন আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে মনে করিয়াছিল দেশের কাজে ডুবিয়া অরুণাকে ভুলিয়া থাকিবে। কিন্তু অরুণা মাত্র একটি দিনের ব্যবধানে চিরকালের জন্য আর এক জনের হইয়া যাইবে, সহসা এই সংবাদ তাহার মর্মস্থলে এমনভাবে আঘাত করিল যাহার ফলে আজ রাজীবের কাছে ইহা অতি স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়িল যে সেই ছোট একটুখানি মেয়ে অরুণা তাহার সমগ্র সত্তার সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বন্ধন তাহাকে ছিন্ন করিতেই হইবে। যতই কঠিন, যতই মর্মন্তুদ হউক এই আঘাত তাহাকে সহিয়া লইতে হইবে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নিজের মনের ভাব সংযত করিয়া সে পেয়াদাকে বলিল,—"কিন্তু, আমি তো এখন তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না, নিতাই,— যে-কাজের জন্য আমার এখানে আসা, তা' এখনও শেষ হয়নি।" এই বলিয়া রাজীব তাহার পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া পেয়াদার হাতে দিয়া বলিল,—এই টাকাটা নাও, এতোদূর হেঁটে এসেছ, তোমার বোধহয় খাওয়া হয়নি,—কোনো দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে, একটু বিশ্রাম করে বাড়ী ফিরে যেও।"

পেয়াদা বলিল,— "না, দাদাবাবু তা' হবে না, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।"

রাজীব বলিল—"উপায় থাক্‌লে আমি তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই যেতাম, নিতাই,—তুমি খুড়ীমাকে গিয়ে বোলো এখানকার কাজ শেষ ক'রেই বাড়ী ফিরে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রবো, এতে তিনি যেন মনে কোন দুঃখ না-করেন।"

রাজীবের কথায় পেয়াদাটি অগত্যা রাজীবের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিল। রাজীবও তাহার সহকর্মীটির সহিত তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট

গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। ফিরিবার পথে রাজীবের শুধুই মনে হইতে লাগিল—"অরুণার বিয়ে!"

বাসায় ফিরিয়া, হাত-মুখ ধোওয়ার পর বিশ্রাম গ্রহণের জন্য রাজীব একটী ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া বসিতেই তাহার মনে নানা চিন্তা আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু আজ সকল চিন্তাকে ঠেলিয়া শুধু অরুণার চিন্তাই তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।—এই মাত্র কয়েকমাস পূর্বেকার একটী ঘটনা রাজীবের মনে পড়িয়া গেল,—একদিন সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই রাজীব অরুণাকে পড়া বুঝাইয়া দিবার জন্য অরুণাদের বাড়ী গিয়াছিল। পড়া শেষ হইলে অরুণা রাজীবকে বলিয়াছিল—"রাজীবদা', দাঁড়াও, যেও-না—তুমি যে আমাকে সেই চন্দ্রমল্লিকা ফুলের চারাগুলো দিয়েছিলে, তাতে কী-সুন্দর ফুল ফুটেচে, দেখবে চলো।" এই বলিয়া অরুণা রাজীবকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাটী-সংলগ্ন ফুলের বাগানে গিয়া প্রবেশ করিল। সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল; ত্রয়োদশীর চাঁদ সুনীল আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে সারা বাগানটী এক স্নিগ্ধ শুভ্রতায় ভরিয়া গিয়াছিল, যুঁইফুলের সুমিষ্ট গন্ধে চারিদিক আমোদিত; অদূরে বকুল-গাছগুলির উপর দিয়া মৃদু-মন্দ বাতাস বহিয়া আসিয়া দেহ-মন শীতল করিয়া দিতেছিল।

অরুণার সহিত বাগানে প্রবেশ করিয়া রাজীব সেদিন মনে এক অপূর্ব তৃপ্তি এবং আনন্দ বোধ করিয়াছিল। অরুণা রাজীবকে তাহার ফুলগাছের নিকটে লইয়া গিয়া বলিয়াছিল—"রাজীবদা, দ্যাখো—চাঁদের আলোয় ফুলগুলো যেন আরো বেশী শাদা দেখাচ্ছে।—আচ্ছা, রাজীবদা, এ-ফুলের নাম চন্দ্রমল্লিকা কেন?—চাঁদের আলোর মত শাদা ব'লে?...ভাগ্যিস্, দেখে ফেলেছিলুম তাই, নইলে পিসীমা ফুলগুলো তুলে নিয়েছিল

আর কি! পিসীমা বলে কি-না ফুলগুলো তাঁর গোপালকে দেবেন। আমি পিসীমাকে ব'ল্লাম—তোমার গোপাল তো তুলসী-চন্দন আর নাড়ু পেলেই সন্তুষ্ট, ও-ফুলগুলো তুমি তুলো না, পিসীমা,—ফুলগুলো একটা ফুলদানিতে সাজিয়ে আমি রাজীবদা'কে দেবো।…তুমি নেবে রাজীবদা'?—তোমার টেবিলে রেখে দেবে, ভারি সুন্দর দেখাবে,—তুলি ফুলগুলো?—"

রাজীব হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল—"না, ভাই, ফুলগুলো আর তুলে কাজ নেই, ও গাছের ফুল গাছেই ভাল দেখাচ্ছে।—চলো, পুকুর-ঘাটের বেদীর উপর একটু বসি গিয়ে।"

পুকুরের নিকটে গিয়া সদ্য-প্রস্ফুটিত কুমুদফুলগুলির প্রতি রাজীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অরুণা বলিয়াছিল—"আচ্ছা, বল তো রাজীবদা', চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কুমুদফুলগুলো কেন ফুটে ওঠে?—দ্যাখো-না চাঁদের দিকে চেয়ে ফুলগুলো যেন সব হাসচে, আর ফুলগুলোর দিকে চেয়ে চাঁদেরও আনন্দ যেন ধরে না!…আচ্ছা, এতো সব সুন্দর সুন্দর ফুল, তাতে নানা রকম সব প্রাণ-মাতান গন্ধ, নানা-রঙের কত সব সুন্দর নক্সা, আর চাঁদের এই মিষ্টি আলো—এ-সব কে ক'রে দিয়েছে, রাজীবদা?" এই বলিয়া উত্তরের আশায় অরুণা রাজীবের মুখের প্রতি চাহিতেই, রাজীবের দৃষ্টিও অরুণার মুখের উপর পড়িল। শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে অরুণার কিশোর মুখখানি এতো সরল এবং প্রফুল্ল দেখাইতেছিল যে, রাজীবের নিকট তাহা সদ্য-ফোটা একটি শুভ্র ফুলের মতই মনে হইয়াছিল। অরুণা আরও কতবার রাজীবকে কত বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছে, রাজীবের নিজের মনেও ঐ একই ধরণের প্রশ্ন কতবার জাগিয়াছে—"কোন্ যাদুকরী শক্তি মানব-চেতনার অন্তরালে থেকে আবহমান কাল ধ'রে সারা বিশ্বে পত্রে-পুষ্পে,

শিশুর হাসিতে, বালিকার এইরূপ সরল মুখশ্রীতে কত বিচিত্র সৌন্দর্যের সৃষ্টি ক'রে চ'লেছে ?"

সেইদিন অরুণার সেই প্রশ্নে রাজীব শুধু বলিয়াছিল—"জানি না, ভাই, তবে মনে হয়, বিশ্বরচনার সেই শিল্পীটি তাঁর এই অপূর্ব সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছেন। তাঁকে জানার বা দেখার আগ্রহ যার যত প্রবল হয়, তাঁর স্বরূপ ততই তার কাছে মূর্ত হ'য়ে ওঠে, আর সৃষ্টির হেঁয়ালীও তখন তার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে যায়।"

রাজীবের ঐ সকল কথা অরুণা তখন বুঝিতে পারিয়াছিল কি না, রাজীব তাহা জানে না, তবে অরুণা যে রাজীবের কথাগুলি একমনে শুনিতেছিল, অরুণার ধীর-স্থির চাহনি দেখিয়া রাজীব তাহা বুঝিয়াছিল। অরুণার সেই প্রফুল্ল আননের সেই অভিনিবেশ চাহনি রাজীবের অন্তরে আজও যেন ছবির মতই আঁকা আছে।

রাজীব সেই-যে সেদিন অরুণাদের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার পর আর সে ওদিকে যায় নাই। হঠাৎ স্বদেশী-আন্দোলনের ঢেউ তাহাদের দেশেও আসিয়া পড়িয়াছিল। বিনোদবাবু ওসব ব্যাপারে যোগ দিতে রাজীবকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজীবের ভাবপ্রবণ-চিত্ত স্থির থাকিতে পারে নাই—রাজীবও সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এক অর্ডিনান্স জারি করিয়া দেশে সভা-সমিতি এবং পিকেটিং ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, রাজীব নিজকে কর্মব্যস্ত রাখিবার জন্য দিনের বেলায় ক'একটি বাড়ীতে টিউশানি করিত এবং রাত্রে তাহার প্রতিষ্ঠিত নৈশ-বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের শিক্ষায় নিযুক্ত হইত। কিন্তু এতো কাজের ভিতরেও অরুণার চিন্তা তাহার মনে একটা ছোঁয়াচ দিয়া যাইত।

অরুণার সম্বন্ধে রাজীবের মনে কত আশাই না ছিল। রাজীব তাহার জীবনের আদর্শ অনুযায়ী পাড়ার কতকগুলি ছেলে-মেয়েকে ব্যায়াম, সন্তরণ, লাঠি- এবং ছোরা-খেলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়া শক্তিমান এবং চরিত্রবান্ করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। মেয়েদের মধ্যে অরুণাই ছিল তাহার সবচেয়ে কৃতী ছাত্রী।

অরুণার পিতার নিষেধে সাময়িক ভাবে অরুণার সহিত রাজীবের মেলামেশা বন্ধ হইলেও, অরুণার বিষয়ে রাজীব তাহার আশাগুলি একেবারেই ত্যাগ করে নাই। স্বদেশী-আন্দোলনের কাজ হইতে বিরত হইয়া রাজীব ভাবিতেছিল যে, এইবার একদিন অরুণাদের বাড়ী গিয়া সে তাহার খুড়ী-মাকে বলিয়া আসিবে যে, সে আর ও-সব স্বদেশী ব্যাপারে নাই। কিন্তু হঠাৎ অরুণার সম্বন্ধে রাজীব সেদিন যে সংবাদ পাইল, তাহাতে আর যে তাহার খুড়ীমাকে ও-কথা জানাইবার প্রয়োজন আছে তাহা রাজীবের মনে হইল না।

* * *

জমীদার বাড়ীতে রাজীবের আসা বন্ধ হইবার পর হইতে অরুণা কিঞ্চিৎ গম্ভীর এবং কতকটা বিমনা হইয়াই বাড়ীর কাজ-কর্ম করিয়া যাইত। যেদিন অরুণা শুনিল—মহেশপুরে তাহার বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতে তাহার অন্তরে চিন্তার মেঘ যেন আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। অরুণা রাজীবের কথা কতই-না ভাবিয়াছে, কিন্তু নিজেকে বাঁচাইবার কোন পথই সে খুঁজিয়া পায় নাই; তাহার নিরুপায় অবস্থার কথা ভাবিয়া সে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে মাত্র।

অরুণার মা কিছুদিন হইতেই তাঁহার কন্যার এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার উগ্র-মস্তিষ্ক স্বামীর কথা চিন্তা করিয়া, অরুণাকে

কেবলমাত্র সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই করিতে পারেন নাই।

বিবাহের দিন ক্রমেই নিকটবর্তী হইল। কিন্তু, অরুণার নিকট ইহা তাহার বিবাহ নহে—"মৃত্যু"। নির্দিষ্ট দিনে অরুণা ধীরে ধীরে তাহার বিবাহরূপ-যূপকাষ্ঠে নীরব-আর্তনাদে নিজের গলা বাড়াইয়া দিল।

৩

রাজীব তাহাদের গ্রামে যে-কয়েকজন সঙ্গী লইয়া দেশের কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, কিছুদিন যাইতে না-যাইতে সেই-সব সঙ্গীদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিল। এইসব কারণে রাজীব গ্রামে আর কোনো কাজেই তেমন উৎসাহ পাইল না। এইরূপ ব্যর্থ-জীবন লইয়া বাড়ীতে বাস করা রাজীবের পক্ষে বড় অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল। সুতরাং রাজীব বিনোদবাবুর নিকট পত্র লিখিয়া, সবেমাত্র কয়েকদিন হইল, কলিকাতায় আসিয়া বিনোদবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে।

একদিন বিনোদবাবু অফিস হইতে ফিরিয়া, সন্ধ্যার পূর্বে রাজীবকে সঙ্গে লইয়া চা পান করিতে করিতে প্রশ্ন করিলেন,—"কি হে রাজীব, ক'ল্‌কাতা সহর কেমন লাগ্‌ছে?"

রাজীব তাহার জীবনে এই প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়াছে। চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ তুলিয়া রাজীব উত্তর করিল,—"মন্দ কি, বেশ কর্ম্মমুখর জায়গা; এখানকার প্রায় সবাইকে দেখেই মনে হয়—যেন সবাই খুব কাজে-ব্যস্ত। এখানকার লোকের চলা-ফেরা এবং আদব-কায়দা দেখে মোটেই মনে হয় না যে, আমাদের দেশের লোকজনদের সত্যকারের কোনো অভাব আছে।"

বিনোদবাবু তাঁহার কাপের বাকী চাটুকু এক চুমুকে শেষ করিয়া, রাজীবের কথায় সায় দিয়া বলিলেন,—"ঠিক ব'লেছ, রাজীব,—বিলেতের কর্তারা আমাদের দেশের এইসব সহুরে-বাবুদের জীবনযাত্রার মাপকাঠি দিয়েই ভারতবাসীর অবস্থার পরিমাপ করেন এবং সেই অনুপাতে যদি কোন সমস্যা তাঁদের মাপে 'সমস্যা' ব'লে ধরা পড়ে তবে তার প্রতিকারের একটা কৃত্রিম চেষ্টা তাঁরা ক'রে থাকেন। কাজেই আমাদের দেশের সত্যকারের কোনো সমস্যারই সমাধান হয় না। শাসকদের এইরকম সজাগ উদাসীনতার ফলে আজ আমাদের দেশেও কৃষক এবং শ্রমিকদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব ক্রমেই জেগে উঠছে।"

রাজীব বিনোদবাবুর এইরূপ মতামত শুনিয়া একটু অবাক হইয়া বলিল, "আপনি, দেখছি এ-সব ব্যাপার বেশ বোঝেন আর এবিষয়ে চিন্তাও করেন। আচ্ছা, তা'হলে আপনি কোনো আন্দোলনে যোগ দেন-না কেন?"

বিনোদবাবু উত্তর করিলেন,—"কি ক'রবো, রাজীব,—নিরুপায়!—বাবা মারা যাওয়ার পর, সংসারের সমস্ত ভার আমারই ওপর এসে পড়েছে; বাবার পেন্সন, আর আমার চাকরির উপরে নির্ভর ক'রেই আমাকে চ'লতে হ'চ্ছে। কাজেই আজ যদি আমি কোন আন্দোলনে যোগ দিই, তা' হ'লে বাবার পেন্সনের আশা তো আমাকে ছাড়তে হবেই, এমন কি আমার নিজের চাকৃরি অবধি খোয়াতে হবে। তখন সংসার নিয়ে আমাকে যে কী মুস্কিলে পড়তে হবে, তা' আমিই জানি!—মেয়েটাও বড় হ'য়েছে, তারও আজ পর্যন্ত একটা কোন কিনারা করতে পারলাম না; এবার ওকে কলেজে ভর্ত্তি ক'রবার কথা, কিন্তু ওর মার ইচ্ছে—মেয়েকে আর না-পড়িয়ে বিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা।...দেখি, কখন কি হয়।" এই সব কথা বলিতে

বলিতে বিনোদবাবু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"বুঝি সব রাজীব, কিন্তু আমার পক্ষে কিছু ক'রবার উপায় নাই।···আমাদের অপূর্ব এ-সব আরও ভাল বোঝে।"

রাজীব প্রশ্ন করিল,—"অপূর্ব কে?"

বিনোদবাবু।—"আমার ছোট ভাই। তার হাব-ভাব অনেকটা তোমারই মতো।"

রাজীব।—"আপনারা যখন আমাদের দেশে ছিলেন, তখন তো কই আপনাদের সঙ্গে তাঁকে দেখিনি?"

বিনোদবাবু।—"সে তখন মার সঙ্গে আমার মামার বাড়ী থাক্‌তো।"

রাজীব।—"তিনি এখন কোথায় থাকেন?"

"রেঙ্গুনে।—মা-ও রাগ ক'রে চ'লে গেলেন,—তখন ঠিক বুঝতে পারলাম না, রাজীব, এখন বুঝছি—রাগের মাথায় মাকে ওরকম ক'রে বলা আমার ঠিক হয়নি।"

রাজীব বিনোদবাবুকে এইরূপ অনুশোচনাপূর্ণ উক্তি করিতে দেখিয়া কি-একটা প্রশ্ন করিতে যাইবে, এমন সময় নীচে হইতে ডাক আসিল—"কই হে বিনোদ, বেড়াতে যাবে না?"

"এই-যে যাই, একটু দাঁড়াও।" এই বলিয়া বিনোদবাবু রাজীবকে বলিলেন—"চলো, রাজীব, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে গড়ের মাঠ হ'তে একটু বেড়িয়ে আসি।"

বিনোদবাবুর সহিত ভ্রমণে বাহির হইয়া, পথ চলিতে চলিতে রাজীব চিন্তা করিতে লাগিল—"অপূর্বর হাব-ভাব অনেকটা তাহারই মত। লোকটি কি-রকম—তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হ'লে ভাল হয়।" অপূর্বর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই রাজীবের মনে জাগিয়া উঠিল। যতই সে অপূর্বর সম্বন্ধে

চিন্তা করিতে লাগিল, অপূর্বকে দেখিবার একটা আগ্রহ তাহার ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। একবার সে বিনোদবাবুকে প্রশ্নও করিয়া বসিল—"আচ্ছা, অপূর্ববাবু কি এর মধ্যে রেঙ্গুন হ'তে ফিরবেন না?"

বিনোদবাবু উত্তর করিলেন,—জানি না, রাজীব, তার সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা চলে না।"

বিনোদবাবুর বন্ধুটি রাজীবের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, বিনোদবাবু সংক্ষেপে রাজীবের পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"ছেলেটি বেশ, গ্রামে গোঁড়া-হিন্দুপরিবারে মানুষ হ'য়েও, গোড়ামির সব নানা সংস্কার হ'তে ও নিজেকে অনেকটা মুক্ত রেখেছে।" পরে রাজীবকে সম্বোধন করিয়া বিনোদবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, রাজীব, ক'লকাতায় তো এলে, এখন এখানে কি ক'রবে ঠিক ক'রেছ?"

রাজীব বলিল,—"সে-ভার আপনার; আপনি আমার বিদ্যা-বুদ্ধি আগা-গোড়া সবই জানেন। আমাদের সংসারে কিছু অর্থ-সাহায্য করা আমার পক্ষে একটা কর্তব্য, আর তা' দরকারও। এখন কি ক'রলে কি হবে, না-হবে, তা' আপনিই ঠিক ক'রবেন।"

বিনোদবাবু তাঁহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ-হে, এ-ছেলেটিকে তোমাদের জুয়েলারী হাউসে ভর্তি ক'রে দিলে হয় না?—ছেলেটি বেশ ইণ্টেলিজেণ্ট, দরকার মতো ইংরেজিতে কথা-বার্তাও ব'লতে পারে। আমার মনে হয়, কিছুদিন একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিলে, তোমাদের অর্ডার-সিকিওরের কাজ একে দিয়ে ভালই হবে।"

বিনোদবাবুর বন্ধু বলিলেন,—"আমাদের সব জুয়েলারীর ব্যাপার কাজেই এতে একটু বিশ্বাসী লোকের দরকার হয়,—তা' তুমি যখন ব'লছো, তখন সে-প্রশ্ন করাই আমার ভুল। বেশ তো, কালকে দশটার পর

এঁকে একবার আমাদের শো-রুমে পাঠিয়ে দিও, আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

কিছুদিন পূর্বে বিনোদবাবু তাঁহার মাতার সহিত অনেক কথা-কাটাকাটি করিয়াছিলেন, এমন-কি একটু শ্লেষ দিয়াও দুই-একটি কথা তিনি মাকে বলিয়াছিলেন। মা শেষ-বয়সে ছেলের নিকট এরূপভাবে অপমানিতা হবেন, তাহা তিনি আশা করেন নাই। কাজেই মনের খেদে তিনি তাঁর ছোট ছেলে অপূর্বর উদ্দেশে রেঙ্গুন যাত্রা করিয়াছেন। মা চলিয়া যাওয়ার পরেই অপূর্ব বাড়ীতে আসিয়াছিল, কিন্তু অপূর্বর সহিতও বিনোদবাবু মন-খুলিয়া কথা বলে নাই। অগত্যা অপূর্ব মায়ের খোঁজে পুনরায় রেঙ্গুন চলিয়া গিয়াছে। এইসব নানা-কথা চিন্তা করিয়া, বিনোদবাবুর চিত্ত বেদনায় ভাবাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—মাকে যে তাঁর ঐরূপ করিয়া বলা ঠিক হয় নাই, দুইদিন ধরিয়া সেই চিন্তাই মাঝে-মাঝে বিনোদবাবুর মনকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। তিনি তাঁহার বন্ধু—হৃষিকেশবাবুর সহিত গড়ের মাঠে বেড়াইতে আসিয়া, মাঠের খোলা হাওয়ায় মনে অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলেন। রাজীবকেও আপাততঃ একটা কাজে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়া, সেবিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

পরের দিন রাজীব যথা সময়ে কলিকাতার বিখ্যাত "জুয়েলারী হাউসে"র জেনারেল ম্যানেজার—হৃষিকেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। হৃষিকেশবাবু তাঁহাদের অর্ডার ডিপার্টমেন্টের ইন্‌চার্জের সহিত রাজীবের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাজীবের সহিত কথা-বার্তায় ইন্‌চার্জ মহাশয় বুঝিলেন—রাজীবের দ্বারা কাজ ভালই হইবে।

"জুয়েলারী হাউসে" কয়েকদিন যাতায়াত করিয়া কিছু কাজ বুঝিয়া লইবার পর, একদিন রাজীব একজন খরিদ্দারের অর্ডারি দুইগাছা ব্রেসলেট

লইয়া থিয়েটার রোডে মিসেস্ ব্যানার্জী নামে একজন মহিলার নিকট ডেলিভারি দিতে গেল। থিয়েটার রোডে নির্দিষ্ট বাড়ীর সম্মুখে পৌছিয়া রাজীব দেখিল---একটি পিতলের ফলকে লেখা আছে—"Dr. O. N. Bonerjea" ব্যানার্জীর এইরূপ বানান দেখিয়া রাজীব ভাবিল—সাহেব-পাড়ায় ব্যানার্জীর বানান বোধ হয় এইরূপই প্রচলিত আছে। পরে সে আরও লক্ষ্য করিল—পিতল ফলকের উপরে একটি ছোট চিঠির বাক্সের গায়ে লেখা আছে—"Mrs. Bonerjea not at home". রাজীব মনে মনে বলিল—মিসেস ব্যানার্জী বাড়ীতে নাই? তাহা হইলে এতোদূর আসাই তাহার বৃথা হইল? পরক্ষণেই রাজীব ভাবিল—আচ্ছা, একবার বাড়ীর দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক্। ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গাড়ীবারাণ্ডার নীচে একজন বন্দুকধারী দরোয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া রাজীব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই দরোয়ান, ব'ল্‌তে পার—মিসেস ব্যানার্জী কোথায় গিয়েছেন?"

দরোয়ান রাজীবের ভদ্র পোষাক এবং ভদ্র চেহারা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপ কাঁহা সে আ-রহে হেঁ?"—

রাজীব বলিল,—"আমি 'জুয়েলারী হাউস' থেকে আস্‌ছি।"

দরোয়ান ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"জুল্‌রি হোস্?—হাঁ, হাঁ, মেমসাব্ উপরমে হ্যায়,—ইয়ে সিঁড়ি, সিধা চলা যাইয়ে।"

"তিনি যদি উপরেই আছেন, তবে লেটার-বক্সে ও-কথা লিখে রাখার কী দরকার ছিল?"

দরোয়ান রাজীবের কথার অর্থ বুঝিল, এবং একটু হাসিয়া উত্তর করিল,—"আরে বাবুজি, সমঝ্‌তে নেহি—বহুত ফেরিওয়ালে-লোগ্ আ-কর্‌কে বড়া জ্বালান্ করতে হেঁ।"

রাজীব এইবার "Not at home" লেখার তাৎপর্য বুঝিল। কিন্তু দরোয়ান যে বলিল—'মেমসাব্ উপর মে হ্যায়।' সুতরাং দরোয়ান ঠিক কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, সে-বিষয়ে মনে একটু সন্দেহ লইয়াই রাজীব সিঁড়ি বাহিয়া উপরের দিকে উঠিয়া চলিল; দোতলায় পৌছিতেই দেখিতে পাইল—দরজার সামনের বারাণ্ডায় বসিয়া একজন পরিচারিকা একটি দুইবৎসরের শিশুর পায়ে, হেঁট হইয়া, জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিতেছে। রাজীব পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মিসেস ব্যানার্জী বাড়ীতে আছেন?"

পরিচারিকা প্রশ্ন করিল,—"ছোটা মেমসাব্, ইয়া বড়া মেমসাব্?"—

রাজীব বলিল,—আমি তো ঠিক জানি না, তবে যে-ই থাকুন, বাড়ীর মালিকদের একজন কাউকে খবর দাও।"

পরিচারিকাটি ভিতরে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া রাজীবকে বলিল,—"থোড়া ঠাহরিয়ে!"

প্রায় পনেরো মিনিট পরে একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা বাহির হইয়া আসিয়া রাজীবের নিকট সম্পূর্ণ নূতন এক প্রকার স্বরে, রাজীবকে প্রশ্ন করিল,—"কিয়া লায়া হ্যায়?" মহিলাটি এইরূপ ভাষায় প্রশ্ন করিয়াই রাজীবকে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ও তুমি বাঙালী? —কোত্থেকে এসেছ?"

রাজীব মহিলাটির এইরূপ ভাব-ভঙ্গীতে একটু অবাক হইয়া উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, 'জুয়েলারী হাউস' থেকে।"

মহিলা বলিলেন,—"ও, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ছোট মেমসায়েবকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতে উদ্যতা হইলে, রাজীব তাড়াতাড়ি বলিল—আজ্ঞে না, কোনো মেমসায়েবের সঙ্গে তো আমার

দরকার নেই,—মিসেস ব্যানার্জীর দু'গাছা ব্রেসলেটের অর্ডার ছিল, তাই নিয়ে এসেছি।"

মহিলাটি রাজীবের এইরূপ কথায় একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁকেই পাঠিয়ে দিচ্চি, এখানে একটু দাঁড়াও।" এই বলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা ইডিয়েট তো ? বিলিতি আদব-কায়দার সঙ্গে এর কোন পরিচয়ই নাই দেখ্‌ছি।"

প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর, অনুমান প্রায় তিরিশ বৎসর বয়স্কা একটি গৌরবর্ণা মহিলা পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে পাউডার এবং রুজ আর ঠোঁটে লিপষ্টিক পেণ্ট করা, পরণে মভ্-রংএর একখানি জর্জেট সাড়ী। তিনি রাজীবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"এই ঘরে আসুন।"

রাজীব অনুমানে বুঝিল, ইনিই মিসেস ব্যানার্জী। কিন্তু, বাঙালী-মহিলার এইরূপ বেশ-ভূষা, কথা বলার নূতন একপ্রকার ভঙ্গী, এ-সমস্তই রাজীবের নিকট একটু আশ্চর্য বোধ হইল। রাজীব মহিলাটিকে অনুসরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—কক্ষটি বিলাতি-কায়দায় সাজান ; মেঝের উপর একটি সুদৃশ্য কার্পেট বিছান আছে, ঘরের কোণে উঁচু তে-পায়ার উপর অনেক সব ফটো ; কার্পেটের উপর মাঝখানে দুইপাশে দুইটি কাউচ এবং চারি পাশে চারটি কুশন-চেয়ার। প্রত্যেকটি চেয়ারের উপর অরেঞ্জ এবং কালো রংএর সিল্কের চওড়া-চওড়া ডোরা দেওয়া একটি করিয়া তাকিয়া।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া মহিলাটি একটি কাউচে বসিলেন। রাজীবও তাহার সুটকেসটি সামনের টেবিলের উপর রাখিয়া একটি চেয়ারে

বসিতে যাইবে, এমন সময় মহিলাটি একপ্রকার অদ্ভুত সরুগলায় হাঁক দিলেন—"বো—ই—বাবুকো একঠো টুল লা দেও।" বোই উত্তর দিল—"জি হুজুর—" অল্পক্ষণ পরেই একটি মুসলমান বয় একটি টুল লইয়া আসিয়া টেবিলের সম্মুখে রাখিয়া দিলে, মহিলাটি রাজীবকে অঙ্গুলি নির্দেশে টুলটি দেখাইয়া বলিলেন,—"ওতে বসুন।"

বাঙালী-ভদ্রলোকের প্রতি বাঙালী-মহিলার এইরূপ আচরণে রাজীব আশ্চর্য হইল, কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত টুলের উপর বসিল। অতঃপর মহিলাটি বলিলেন,—"কই, কি এনেছেন দেখি।"

রাজীব সুটকেস হইতে ব্রেসলেটের বাক্সটি বাহির করিয়া মহিলার হাতে দিল। ব্রেসলেট দুইগাছা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইয়া মহিলাটি রাজীবের ভাউচার বহিতে সহি করিয়া দিলেন।

ভাউচার বহিতে স্বাক্ষর লইয়া রাজীব এই নকল-মেমসাহেবটিকে একটি নমস্কার জানাইয়া তথা হইতে নীরবে প্রস্থান করিল।

৪

রাজীব তাহার জীবনে এই সর্বপ্রথম বিলাতি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিদেশী আদব-কায়দায় অভ্যস্ত বাঙালী পরিবারের সংস্পর্শে আসিল। পরের দিন রাজীবকে আরও দুই একটি বাড়ীতে 'জুয়েলারী হাউসে'র কাজ লইয়া যাইতে হইল। কিন্তু, রাজীব সর্বত্রই দেখিল—একই প্রকার হাব-ভাব, একই প্রকার আদব-কায়দা। একটি বাঙালী-পরিবারকে সে দেখিল—স্ত্রী-পুরুষ সকলে ইংরাজী ভাষাতেই কথা বলিতেছে, এমন কি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরাও ইংরাজী বা হিন্দি ব্যতীত নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলিতে পারে না! রাজীব ইহাতে খুবই আশ্চর্য হইল। ইংরাজী শিক্ষা ভারতে সর্বপ্রথম যে বাঙালী সমাজের মধ্যেই অধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা রাজীব জানিত। কিন্তু, জাতির এই জাগরণ-যুগে এখনও যে এইরূপ সব পরধর্ম-বিলাসী বাঙালী সমাজ বাস করিতেছে, তাহা রাজীবের ধারণার অতীত ছিল। জগতে বিভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্যকরূপে পরিচিত হইতে হইলে, ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানার্জন জাতির পক্ষে যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা রাজীব অস্বীকার করে না। কিন্তু, তাই বলিয়া ইংরাজী শিক্ষার ফলে জাতির নিজস্ব সব সহজ বৃত্তি এবং বৈশিষ্ট্যকে মন হইতে উৎপাটিত করিয়া, অন্তরে পরবৃত্তির প্রাধান্য স্থাপন কোন জাতি বা সমাজের পক্ষে যে মঙ্গলকর হইতে পারে, তাহা রাজীব কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু, এই বিলাত-ফেরৎ সম্প্রদায়ের একটি জিনিষ রাজীবের খুবই ভাল লাগিল, তাহা হইতেছে—ইঁহাদের সকল বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং সব জিনিষের একটা যথাযথ বিধি-ব্যবস্থা। কিন্তু অপর দিকে সে ইঁহাদের

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিল তাহা হইতেছে—নিজেদের কোন কাজের বেলায় ইঁহাদের 'সময়ের মূল্যজ্ঞান' যেরূপ টন্‌টনে, অপরের সহিত ব্যবহারের বেলায়, ইঁহাদের সেই জ্ঞানের একান্ত অভাব। কারণ, ক'একটি বাড়ীতে রাজীব 'মেমসায়েবে'র নির্দেশমত ঠিক সময়ে পৌছিয়াও, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর তবে 'মেমসায়েবে'র সহিত তাহার সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছে। সভ্যতার শিখরের একেবারে শীর্ষ দেশে উন্নীত এই 'ইঙ্গবঙ্গসম্প্রদায়ে'র ভাল-মন্দ সকল বিষয় লইয়াই রাজীব চিন্তা করিতে লাগিল।

পর দিন সন্ধ্যার অনতিকাল পরে, 'জুয়েলারী হাউসে'র কাজের বিষয় লইয়া, রাজীব বিনোদবাবুর সহিত আলোচনায় রত আছে, এমন সময় তথায় 'নির্মলবাবু' নামে বিনোদবাবুর এক ব্রাহ্ম বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিনোদবাবু তাঁহার বন্ধুকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই-যে নির্মল, এসো-এসো, বোসো।"

রাজীব নির্মলবাবুকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনোদবাবু তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন,—"এই ছেলেটির কথাই তোমাকে সেদিন ব'লছিলাম, এরই নাম রাজীবলোচন গোস্বামী।"

রাজীব হাত তুলিয়া নির্মলবাবুর প্রতি নমস্কার জানাইলে, নির্মলবাবু রাজীবকে বলিলেন—"বসুন, রাজীববাবু, বসুন। সেদিন আমি বিনোদের কাছে আপনার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি।" এই বলিয়া নির্মলবাবু একটি চেয়ারে বসিলে, রাজীবও তাহার নিজের আসন গ্রহণ করিল। নির্মলবাবু বলিতে লাগিলেন,—"আপনি গোঁড়া-হিন্দুপরিবারে মানুষ হ'য়েও, হিন্দু-সংস্কারের প্রভাব থেকে নিজেকে যে মুক্ত রাখতে পেরেছেন, তা' সত্যিই একটু আশ্চর্যের বিষয়!—কী জঘন্য সব বিধি-ব্যবস্থা এইসব অশিক্ষিত

গোঁড়া হিন্দুগুলোর; ওদের দেখলেই যেন মনে কেমন একটা ঘেন্না আসে।"

রাজীব নির্মলবাবুর এইরূপ উক্তিতে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে ধীর এবং স্পষ্ট ভাষায় উত্তর করিল,—"কোনও সমাজ বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মনে একটা ঘৃণা বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করা সহজ, কিন্তু তা' মহৎ নয়।"

নির্মলবাবু কিঞ্চিৎ গর্বভরে উত্তর করিলেন,—"আপনি জানেন না, আমাদের উদ্দেশ্য ঢের মহৎ।"

রাজীব।—আপনাদের উদ্দেশ্য-যে মহৎ নয়, সে-কথা তো আমি ব'ল্‌ছি না, কিন্তু উদ্দেশ্য আর মনোবৃত্তি, দুটো ঠিক এক জিনিষ নয়। সমাজের সংস্কারক যাঁরা, তাঁরা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণা নিয়েই কাজে নামেন; তাঁদের দৃষ্টি হয় পক্ষপাতশূন্য এবং মন হয় সকল প্রকার সংস্কার মুক্ত। সমাজদেহ হ'তে যে-ঘৃণাকে তাঁরা মুছে ফেলতে চান, সেই ঘৃণাকেই আবার অন্যরূপে সংস্কৃত সমাজের দেহে ঢুকতে দেওয়া মোটেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য থাকে না।"

নির্মলবাবু।—তাই বলে যে-সব আচার-নীতির কোনই মানে হয় না, হিঁদুদের যে-সব কাণ্ড সহের বাইরে, তাকে আমি ঘৃণা ক'রবো না?

রাজীব।—সেটা আপনার নিজস্ব রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু, এটা ঠিক জানবেন—ঘৃণা ক'রলে একদিন ঘৃণা পেতেও হয়। যার ফল আজ ভোগ ক'রতে হচ্ছে সমগ্র হিন্দুসমাজকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের সত্যকারের রূপ ও দৃষ্টি ছিল অন্য রকমের—তাঁরা নিজেদের আচার-নীতি শ্রদ্ধার সহিত পালন ক'রে চ'লতেন, এ যেমন সত্য, তেমনি তাঁরা অপর সমাজ বা সম্প্রদায়ের আচার-নীতিকে কখনও ঘৃণা বা অবজ্ঞা ক'রতেন না, তাও

ঠিক তেমনিই সত্য। কিন্তু কালের প্রভাবে, যে-কোনো কারণেই হোক, আমাদের সমাজ-দেহ আজ কুসংস্কারের নানান আবর্জনায় ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। সমাজ-দেহ হ'তে এই সব আবর্জনা পরিষ্কার ক'রে একে যুগোপ-যোগী ক'রে নূতন রূপে গ'ড়ে তুলতে হ'লে, সমাজে এমন সব কর্মী দরকার যাদের দৃষ্টি হবে উদার পক্ষপাতশূন্য, কোনো রকম অহঙ্কার তাদের থাকবে না এবং তাদের প্রাণ হবে নিঃস্বার্থ কর্মের প্রেরণায় ভরপুর। সমগ্র হিন্দু-সমাজকে একটা অখণ্ড দেহ হিসেবে দেখতে হবে। আমাদের শরীরের কোন অংশের দুষ্ট ক্ষতকে উপযুক্ত চিকিৎসা ক'রে সম্পূর্ণভাবে না সারিয়ে শরীরের সেই অংশটাকে কেটে বাদ দিয়ে শরীরটাকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে যেমন সেই শরীরকে অকর্মণ্য ক'রে রাখা হয়, তেমনি সমাজের মধ্যে বাস ক'রেই সমাজের সংস্কার সাধন না-ক'রে, সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে নানা দলে পৃথক হ'যে থাকলে, অঙ্গহীন দেহের মতই সমাজ-দেহও দুর্বল এবং অকর্মণ্য হ'য়ে পড়ে। আর কাজে হয়েছেও তাই।"

নির্মলবাবু রাজীবের কথাগুলি বেশ মন দিয়া শুনিতেছিলেন। রাজীবের বক্তব্য শেষ হইতেই তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"আপনার যুক্তি আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু সমাজ হ'তে পৃথক হ'য়ে, আপন ঘরে পরের ম'ত বাস করার জন্য দায়ী তো আমরা নই, রাজীববাবু! এর জন্য দায়ী হিন্দুসমাজের তখনকার প্রধান প্রধান কর্তারা। দেশে ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে বাঙ্গালী যুবকেরা উচ্চশিক্ষার জন্য যখন বিলেতে যেতে আরম্ভ করল, তখন সমাজপতিদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাদের ওপর। বিলেত হ'তে ফিরে এসে, সেই সব যুবকেরা আর সমাজে স্থান পেল না। কারণ ম্লেচ্ছের দেশে গিয়ে তাদের জাত-ধর্ম একেবারে সব নষ্ট হ'য়ে গিয়ে-ছিল! সমাজ হ'তে এ-রকম ভাবে উপেক্ষিত হওয়ার জন্য, তখনকার

শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে কুসংস্কার বর্জিত নূতন এক সমাজ গ'ড়ে তোলা অপরিহার্য হ'য়ে পড়েছিল—তাঁদেরই ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ব্রাহ্ম-সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল।"

রাজীব বিনীতভাবে উত্তর করিল—"স্বীকার করি. সমাজপতিদের যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের ফলেই, সমাজের মধ্যে যতসব বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কারণ, বর্তমান যুগের মানব-মন অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে কোনো ব্যবস্থাকেই আর মেনে চ'লতে রাজি নয়,—বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যাচাই ক'রে সব জিনিষকে মেনে নেওয়া হচ্ছে এখনকার মনের ধর্ম; অতীতযুগে যে-আচার-নীতি সমাজের পক্ষে প্রয়োজন ছিল, বর্তমানযুগে তার প্রয়োজন শেষ হ'য়েছে ব'ললে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং কালের পরিবর্তনের সাথে সমাজের আচার-নীতিরও একটা পরিবর্তন করা একান্ত দরকার হয়। আমি তো আগেই ব'লেছি—সমাজ-সংস্কারের প্রবর্তক যাঁরা, তাঁরা পক্ষপাতশূন্য উদার দৃষ্টি নিয়েই তাঁদের কাজ আরম্ভ ক'রেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে, যাঁদেরকে নিয়ে সংস্কৃত-সমাজ ক্রমশঃ বেড়ে উঠলো, তাঁদের অনেকের মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টির অভাব দেখা গিয়েছে। বর্তমানে এই সমাজের মধ্যে আবার বিভিন্ন শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়; তার মধ্যে এক শ্রেণী হ'চ্ছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং অপর শ্রেণী হ'চ্ছে বিলাত-ফেরৎ সম্প্রদায়, এঁদেরকে অনেকে এককথায় 'ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়' ব'লে থাকেন। এই ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই তাঁদের প্রকৃতিগত সহজ বৃত্তিগুলোকে, একরকম ইচ্ছে ক'রেই, চাপা দিয়ে রেখে বিজাতীয় ভাবধারা ও বিজাতীয় আদব-কায়দার সঙ্গে নিজেদেরকে কোনো রকমে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলেন। এঁদের চিন্তা, এঁদের কথা-বার্তা, এঁদের প্রত্যেক ভাব-ভঙ্গী একেবারে কৃত্রিমতায় পূর্ণ—অকৃত্রিম আনন্দের কোনো স্পর্শই এঁদের মধ্যে পাওয়া যায় না; সে

আনন্দের উৎসকে এঁরা যেন চেষ্টা ক'রেই চাপা দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু, এই সমাজের মধ্যবিত্তেরা এ-রকম আত্মঘাতী পর-নীতির প্রভাব থেকে নিজেদেরকে অনেকটা মুক্ত রেখেছেন ব'লে মনে হয়—এঁদের জীবনে নিজেদের প্রকৃতিগত সহজ ভাবের পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়।"

রাজীব আরও বলিতে লাগিল—"আজ কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে অনেক অপ্রিয় সত্য আমাকে ব'লতে হচ্ছে, এজন্য মনে কিছু ক'রবেন না, নির্মলবাবু,—আপনাদের সমাজভুক্ত অনেকেরই, বিশেষ ক'রে এই ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের, মনে সব সময়ের জন্য এই ধারণা লেগে আছে যে, তাঁদের যে পৈতৃক-সমাজ হ'তে তাঁরা বেরিয়ে এসেছেন, সেই সমাজের লোকগুলো একেবারে অপদার্থ,—তাদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব সব সময়েই এঁদের মনে লেগে রয়েছে। সুতরাং সমাজ-সংস্কারকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আজ এঁরা একেবারেই ভুলে গিয়েছেন—গোঁড়া হিন্দুসম্প্রদায়ের ম'ত এঁরাও একই আবরণে ঢাকা পড়ে আছেন, তবে এঁদের আবরণের উপরটা বেশ পালিশ করা এবং সুদৃশ্য, এই যা তফাৎ। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সমাজের গোঁড়ামির কোটরে আবদ্ধ, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।"

বিনোদবাবু এতক্ষণ উভয়ের আলোচনা নীরবে শুনিতেছিলেন মাত্র। রাজীব তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া, বিনোদবাবুর মুখের দিকে চাহিতেই তিনি নির্মলবাবুকে বলিলেন,—"রাজীব খুবই সত্যি কথা বলেছে, নির্মল! ও যে-ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কথা বল্‌লো, সত্যিই এই সমাজের প্রায় বেশীর ভাগ লোকই সরকার বাহাদুরের বড় বড় চাকরির আওতায় থেকে বেশ আরামে দিন কাটাচ্ছে—নিজের নিয়েই এঁরা ব্যস্ত; হিন্দুসমাজের সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে এঁরা-যে কত বড় হ'য়েছেন, এই অহংকারেই এঁরা মত্ত—এর ফলে এঁদের অন্তরের সত্যকে এঁরা একরকম ভুলেই গিয়েছেন। অবিশ্যি, এঁদের

মধ্যে এমনও দু'একজনকে দেখা যায়, যাঁরা সত্যিই এই সব অহংকার থেকে নিজেদের অনেকটা বাচিয়ে সহজ স্বাভাবিক জীবন যাপন ক'রছেন—কোনো কৃত্রিমতা বা গোঁড়ামিই তাঁদের চিত্তকে পঙ্গু ক'রতে পারেনি।...তবে একটা কথা স্বীকার ক'রতেই হবে, রাজীব,—ব্রাহ্ম-সমাজের পরিণতি যা-ই হোক-না কেন, সমাজ-সংস্কারের প্রতি এই সমাজের দান অমূল্য এবং সেজন্য এই সমাজ চিরদিনই আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু।"

রাজীব বলিল,—"ব্রাহ্ম-সমাজকে আমি তো কোনো দিনই অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিনি, বিনোদবাবু,—কোনো বস্তু বা বিষয়ের অন্তরের প্রকৃত সত্যের উপযুক্ত মূল্য দিতে বা সেই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে আমি সব সময়েই প্রস্তুত। তবে আমার মনে হয়—বর্তমানে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রয়োজন শেষ হ'য়েছে, কারণ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রাহ্ম-সমাজের আবির্ভাব হ'য়েছিল, সে উদ্দেশ্য যথেষ্ট সফল হ'য়েছে; আজ দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু পরিবারই ব্রাহ্ম-সমাজ প্রবর্তিত বিধি-ব্যবস্থা মেনে চ'লেছেন, যেমন—স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ নিরোধ এবং খাদ্যাখাদ্য বাছ-বিচারের সংস্কার বর্জন। এই সব বিষয়ে শিক্ষিত পরিবার মাত্রেই বিশেষ অবহিত হ'য়েছেন দেখতে পাওয়া যায়।"

বিনোদবাবু রাজীবের উক্তির সমর্থনে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, মানি, কিন্তু এই বিরাট হিন্দু সমাজের সামান্যমাত্র অংশ সংস্কার বর্জন ক'রলেই তো হ'ল না, এ-জন্য সারা সমাজের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন চাই।"

রাজীব বলিল,—"তা' স্বীকার করি। শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন একবার সমাজের প্রকৃত গলদ বুঝতে পেরেছেন, তখন সমাজে আরও ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রবর্তন ক'রলে ক্রমশঃ সমগ্র সমাজ থেকে সমস্ত গলদ আপনা আপনিই দূর হ'য়ে যাবে।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "সে যাই হোক্, ব্রাহ্ম-সমাজের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজ এখনও সজাগ হয়নি; যে একেশ্বরবাদ এবং নিরাকার ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করা প্রবর্তকদের উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু-সমাজ এখনও সে বিষয়ে অন্ধতারই পরিচয় দেয়।"

বিনোদবাবুর এইরূপ উক্তিতে রাজীব বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, একটু মৃদু হাসিল মাত্র, এবং ধীর অথচ স্পষ্ট ভাবে উত্তর করিল,—"আপনি কি মনে করেন, বিনোদবাবু যে, আপনাদের ব্রাহ্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই দৃষ্টি ঈশ্বরের সেই নিরাকারত্ব সম্বন্ধে একেবারে খুলে গিয়েছে? ধর্ম-সংস্কার এবং সমাজ-সংস্কার এ দুটো একেবারে পৃথক জিনিষ ব'লে আমি মনে করি। রামমোহনের নিজের জীবনে উপলব্ধির স্তরের সেইরূপ কোনো একটি ক্ষেত্রের জ্ঞান লাভ করা হয়তো সম্ভব হ'য়েছিল, কিন্তু সমাজভুক্ত সকলেরই পক্ষে একেবারে সেই স্তরের চেতনা লাভ করা কি সম্ভব?—জগতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি বিভিন্নরূপ প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কাজেই বিভিন্ন ব্যক্তির চেতনার বিকাশও ঠিক একই ধরণের হয় না। সেজন্য, হিন্দুধর্ম-মতে, উপযুক্ত গুরু বা দ্রষ্টা মাত্রেই মানবের স্বরূপ উপলব্ধির সাধনায় ভিন্ন আধারকে ভিন্নরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিক্ষা এবং উপদেশের মধ্যেই তার সত্য পরিচয় আমরা পেয়েছি। কারণ, আমাদের মতো সংসারের সাধারণ সব দেহাত্মবোধি জীব ভগবানের কাছে যখনই কোনো প্রার্থনা জানাতে যায়, তখনই ভগবানের বিশেষ কোনো একটা রূপ তাদের কল্পনায় স্বতঃই ভেসে ওঠে; সাধন পথের চরম-সিদ্ধির সাধক তখন সেই বিশেষ রূপকেই আশ্রয় ক'রে ক্রমশঃ সেই রূপাতীত অনন্ত-সত্তার অনুভূতিলাভে সমর্থ হয়। উপনিষদে ব্রহ্মের সাকার এবং নিরাকার, উভয় অবস্থার অস্তিত্বই স্বীকার করা হ'য়েছে এবং

এই স্বীকারের পিছনে সত্যকারের যুক্তি-প্রমাণ আছে। কিন্তু বর্তমানে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সাধারণের চেতনা ঈশ্বরের সাকার পূজার মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে আছে—রূপাতীত অখণ্ড সত্তার পরিচয় খুব কম লোকেই জানে। অপর পক্ষে ব্রাহ্ম-সমাজ ঠিক ঐ একই ভুল ক'রে আসছেন—তাঁরা ঈশ্বরের নিরাকার অবস্থাকেই তাঁর একমাত্র অবস্থা ব'লে লোক সমাজে প্রচার ক'রে থাকেন, মানবের পক্ষে সাকার সাধনারও যে প্রয়োজন আছে তা তাঁরা মোটেই স্বীকার করেন না—মূর্তিপূজার প্রতি তাঁদের অন্তরে একটা বিদ্বেষ লেগেই আছে। ঈশ্বরের পরাশক্তি প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন চেতনা-বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে বিভিন্নরূপে যে আবির্ভূতা হন, এ-সত্য তাঁরা মোটেই উপলব্ধি ক'রতে চান না।...সে যাই হোক ঈশ্বরের সাকার নিরাকার অবস্থা সম্বন্ধে বিচার ক'রবার মতো উপযুক্ত জ্ঞান আমার নাই এবং আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুও মূলতঃ তা' নয়—আমি এই ব'লতে চাই যে, যে-বিরাট হিন্দু-সমাজ, যে-কোন কারণেই হোক, এখনও বহু সম্প্রদায়ে বা বহু সমাজে বিভক্ত হ'য়ে আছে সেই সব সমাজ বা সম্প্রদায়ের পক্ষে আজ প্রয়োজন—ধর্মের এবং সাংসারিক আচার-নীতির সকল প্রকার সংস্কার হ'তে মুক্ত হ'য়ে সমগ্র হিন্দু-সমাজের শক্তিকে একীভূত ক'রে এক 'অখণ্ড হিন্দুসমাজে' পরিণত করা, যার লক্ষ্য হবে—এক-নীতি এক-ধর্ম এক-মন্ত্র সাধন।"

ঘড়িতে টং টং শব্দে নয়টা বাজিয়া গেল। নির্মলবাবু বলিলেন "ওঃ ন'টা বেজে গেল যে! আজ তা হ'লে উঠি বিনোদ!" চেয়ার হইতে উঠিয়া রাজীবকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আলোচনায় একটা বিষয় আজ আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। আপনার চিন্তা এবং দৃষ্টি যে সুদূরপ্রসারী তা আমাকে স্বীকার ক'রতেই হবে। পরে

এ সব বিষয়ে আপনার সঙ্গে আরও আলোচনা ক'রবার আশা রাখলাম রাজীববাবু!"

রাজীব নির্মলবাবুর এইরূপ প্রশংসাসূচক উক্তিতে একটু বিনয়নম্র হাসির সহিত হাত তুলিয়া নির্মলবাবুকে নমস্কার করিল। নির্মলবাবুও প্রতি-নমস্কার জানাইয়া, বিনোদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আজ আসি বিনোদ।"

৫

আজ রবিবার। রেঙ্গুনে "পথের দাবী"র সভ্যদের সেই স্কুলগৃহ। প্রাতঃকালে ভারতীর কক্ষে সভ্যরা নানা বিষয়ের আলোচনায় রত আছে। আলোচনা শেষ হইলে সকলের অনুরোধে শশী তাহার রচিত একটি গান গাহিয়া শুনাইল। গানটির শেষ কয়েকটি ছত্র নিম্নলিখিতরূপ :

এ-যে মোদের চলার পথের দাবী,
ওরে! ছুটে আয়, তোরা কে যাবি—
মোরা সোণার রাজ্য তুলিব গড়ি',
মোরা পথের কণ্টক ফেলিব উপাড়ি'—
মোদের নাহি কোনো ভয় উঠি কি পড়ি—
জানি অন্তে মোদের হবে জয়,—
ওরে! নাহি ভয়, নাহি ভয়!

শশীর গান শেষ হইতেই, অপূর্ব বলিয়া উঠিল—"সাবাস, কবি! এই রকম দৃঢ়তা এবং জ্বলন্ত বিশ্বাস নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে চলতে হবে।"

ভারতী বলিল,—"একটু থামুন তো, নীচে থেকে কে যেন ডাকছে।" সকলেই শুনিতে পাইল,—

"এ-বাড়ীতে অপূর্ববাবু ব'লে কেউ আছেন?"—

অপূর্ব তাড়াতাড়ি জানালার নিকট আসিয়া নীচের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল—একজন যুবক ঘোড়ার গাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কোত্থেকে আসছেন?

উত্তর আসিল—"কোলকাতা থেকে।"

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া গিয়া দেখিল, গাড়ীর ভিতর হইতে তাহার দাদা বিনোদবাবু বাহির হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গের যুবকটি আমাদের রাজীব।

অপূর্ব তাহার দাদার এইরূপ অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে একটু বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—একি, দাদা যে! আমার ঠিকানা জানা নেই, কিচ্ছুনা —আপনি কি ক'রে খোঁজ ক'রে এখানে এলেন?"

অপূর্বর নিকট হইতে তারযোগে মাতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বিনোদ-বাবুও অপূবকে তারযোগে কেবলমাত্র সমবেদনা জানাইয়াই অপূর্বর প্রতি নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কারণ, অপূর্বর প্রতি বাহ্যতঃ তিনি যত রূঢ় ব্যবহারই করুন না কেন, ভ্রাতার প্রতি তাঁহার অন্তরের প্রকৃত আকর্ষণকে তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই! সুতরাং স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া, বিনোদবাবু নিজেই রেঙ্গুনে যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু অফিসের ছুটি মঞ্জুর হইতে বিলম্ব হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুন যাত্রা করিতে পারেন নাই। যেদিন ছুটি মঞ্জুর হইয়া আসিল, সেইদিনই বিনোদবাবু রাজীবকে সঙ্গে লইয়া রেঙ্গুন যাত্রা করিলেন। অপূর্ব উপস্থিত রেঙ্গুনে কোথায় কি অবস্থায় আছে, বিনোদবাবুর যদিও তাহা জানা ছিল না, তথাপি যেমন করিয়াই হউক, তিনি-যে অপূর্বর সন্ধান করিয়া লইতে পারিবেন, সে-ভরসা তাঁহার ছিল।

• জাহাজ হইতে নামিয়া প্রথমে তাঁহারা ধর্মশালায় ওঠাই স্থির করিয়াছিলেন। ধর্মশালায় পৌঁছিয়া বিনোদবাবু সেখানকার দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দুই সপ্তাহ পূর্বে একজন বাঙালী ভদ্রলোক একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া এই ধর্মশালায় আসিয়াছিলেন কি না?

দরোয়ান একটু ভাবিয়া উত্তর করিল—"হাঁ, বাবুজি, এক বাংগালী-বাবু মাইজীকো সাথ লে-করকে ইঁহা আয়াথা—লেকিন উয়ো বুড়্‌টি মায়ী তো মর্ গয়ী, বাবুজি!—বাবুকো উস্‌রোজ বড়ী তক্‌লিফ্ হুয়ী!"

দরোয়ানের কথায় বিনোদবাবুর চিত্ত মাতার শোকে পুনরায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি কোন প্রকারে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া দরোয়ানকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"তারপর সেই বাবুটি কোথায় গেল, ব'লতে পার?"

দরোয়ান ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল—"নেহি, বাবুজি, ইয়ে তো ম্যায় নেহি কহ্ সকতা,—ম্যায়নে ইত্‌নাহি দেখা কি কম্‌তি উম্মর কি এক গোরী-সি জানানা আকর্ বাবুজিকো সাথ লে গয়ী—আব উয়ে-লোগ্ কাঁহা গয়ে ইয়ে তো মুঝে মালুম নেহি হ্যায়, বাবুজি! আচ্ছা, আপ ঠাহরিয়ে, ম্যায় দেখতা-হুঁ—জিস গাড়ী 'পর উয়ে-লোগ্ গয়ে-থে, উয়ো গাড়ীমান-কো আগর মিলে তো উস্‌সে আপকো উন্‌কা পাত্তা মিল সক্‌তা হ্যায়।"

এই বলিয়া দরোয়ানটি গাড়ীর খোঁজে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই একজন কোচম্যানকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বিনোদ-বাবুকে বলিল—"আপকী তগ্‌দির বড়ী আচ্ছী হ্যায়, বাবুজি! ঘোড়াগাড়ীকে আড্ডে 'পর পহচতেহি ইহ গাড়ীমান মিল গিয়া,—ইসিকী গাড়ী'পর উসরোজ উয়ো মাইজী বাবুকো সাথ লে গয়ী। আপ্ চাহিয়ে তো, আভি ইস্‌কী গাড়ী'পর চলে যাইয়ে, আগর বাবুজি উঁহা হোঙ্গে তো জরুর আপকো মিল যায়েঙ্গে।"

এই কথা বলিয়া দরোয়ান কোচম্যানকে তাহার গাড়ী আনিতে ইঙ্গিত করিল। কিছুক্ষণ পরে ধর্মশালার ফটকের সম্মুখে গাড়ী আসিয়া

উপস্থিত হইল। বিনোদবাবু আর বিলম্ব না করিয়া, রাজীবকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন; বিছানাদি গাড়ীতে তোলা শেষ হইলে, দরোয়ানটি সেলাম ঠুকিয়া বিনোদবাবুর সম্মুখে হাজির হইতেই, বিনোদবাবু বলিলেন,—"ও, হ্যাঁ, এই নাও।" বলিয়া দরোয়ানের হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলেন,—"তুমি আজ আমাদের অনেক উপকার ক'রলে, দরোয়ান!"

দরোয়ান উত্তর করিল,—"ক্যা-ওর কিয়া, বাবুজি, পরদেশমে আপ্‌লোগোকে আশ্‌রে 'পর পড়ে হেঁ।" এই বলিয়া দরোয়ান বিনোদবাবুকে আর-একটি সেলাম জানাইল। বিনোদবাবু কোচম্যানকে বলিলেন,—"এইবার গাড়ী হাঁকাও।"

গাড়ীতে আসিতে আসিতে, পথি-মধ্যে মাতার সম্বন্ধে নানা-চিন্তা বিনোদবাবুর চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। তাহার আচরণের জন্য শেষ-বয়সে গৃহহীনা হইয়া বিদেশে ধর্মশালায় তাহার মাতাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং সেজন্য অপূর্বকেও যথেষ্ট দুর্ভোগ সহিতে হইয়াছে,—ইত্যাদি বিষয় যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল! বিনোদবাবু এই সংকল্প লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন—যে-কোনো প্রকারে হউক, তিনি তাঁহার ভাইকে কলিকাতায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন।

গাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিনোদবাবু যখন মুণ্ডিত-মস্তক অপূর্বকে দেখিতে পাইলেন তখন আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না, অপূর্বর প্রশ্নে বিনোদবাবু উত্তর করিলেন,—"ধর্মশালায় দরোয়ানের কাছে মাকে নিয়ে তোমার দুর্ভোগের কথা সবই জানতে পেরেছি, অপূর্ব!—মা আমার উপর অতি সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিয়েছেন!"

অপূর্ব তাহার দাদার এইরূপ মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া একটু

আশ্চর্য হইল বটে, কিন্তু সমবেদনায় তাহার চিত্তও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে একটি চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল,—"অদৃষ্টলিপি আর কে খণ্ডাবে বলুন? গত বিষয়ে শোক বা অনুতাপ ক'রে আর লাভ নেই, দাদা, চলুন ওপরে যাই।"

বিনোদবাবুর অন্তরের ক্ষোভ কিছুতেই প্রশমিত হইতেছিল না, তিনি অপূর্বকে পুনরায় বলিলেন,—"তোমাদের প্রতি আমার ব্যবহারের জন্য তোমার কাছে আজ ক্ষমা চাইবারও অধিকার আমার নেই, অপূর্ব!"—

দাদার এইরূপ অনুশোচনাপূর্ণ উক্তিতে অপূর্ব তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া বলিল,—"দাদা, ও-সব কথা ব'লে আমাকে অপরাধী ক'রবেন না, —আপনি বড় ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছেন, হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম ক'রবেন, চলুন।"

রাজীবকে দেখাইয়া অপূর্ব প্রশ্ন করিল,—"ইনি কে?"

বিনোদবাবু বলিলেন, "ওর পরিচয় আমাকে দিতে হবে না, ও নিজেই তোমার সঙ্গে পরিচয় ক'রে নেবে 'খন,—ওর নাম রাজীবলোচন গোস্বামী।"

বিনোদবাবু অপূর্বকে রাজীবের নাম বলিতেই, রাজীব হাত তুলিয়া অপূর্বকে নমস্কার জানাইল। অপূর্বও প্রতি-নমস্কার জানাইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া উপরে গিয়া উঠিল। ভারতী ঘরের বাহির হইয়া সিঁড়ির নিকট আসিতেই দেখিতে পাইল, সকলে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। অপূর্ব ভারতীকে আসিতে দেখিয়া আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল,—"দাদা এসেছেন ভারতী! সঙ্গে এই ভদ্রলোকটিও এসেছেন, এঁর নাম রাজীববাবু।"

ভারতী-বিনোদবাবুকে একটু নতভাবে নমস্কার জানাইল এবং তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়া চেয়ারগুলি একটু গুছাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আপনারা ভেতরে এসে বসুন।" এই বলিয়া অপূর্বকে জিজ্ঞাসা করিল—"ওঁদের জিনিষ-পত্র সব কোথায়?"

বিনোদবাবুর খেয়াল হওয়ায় তিনি বলিলেন—"ও-গুলো সব নীচেই আছে,—চল রাজীব, আমরা ধরাধরি ক'রে জিনিষগুলো নিয়ে আসি।"—

ভারতী বলিয়া উঠিল,—"সে কি! আপনারা বসুন গিয়ে।" এই বলিয়া ভারতী তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাক দিল—"মঙ্গল! নীচে বাবুদের যে-সব জিনিষ-পত্র আছে, সেগুলো নিয়ে এসে ওপরে পাশের ঘরে রাখ।"

ভারতী পুনরায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 'পথের দাবী'র সভ্যদের সহিত বিনোদবাবুর পরিচয় করাইয়া দিল। বিনোদবাবু ভিতরে আসিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভারতী পরিচয় করাইয়া দিবার পর সকলেই সহাস্তে বিনোদবাবুকে অভিবাদন জানাইল। শশী বলিল—"আজ আপনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়াটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার! মাতৃবিয়োগে আপনার মানসিক অবস্থা ভারাক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, আমি কিছুতেই আপনাকে আমাদের মাঝে এ-রকম শোক-বিহ্বল অবস্থায় থাকতে দেব না—আমি আপনাকে রোজ আমার কবিতাগুলো প'ড়ে শোনাব, দেখবেন—আপনার শোক-দুঃখ কোথায় মিলিয়ে যাবে!—আচ্ছা, আপনারা তা' হ'লে এখন বিশ্রাম করুন, আমরা আসি।" এই বলিয়া সকলে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল।

ঘরের দেয়ালে, যেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"পথের দাবী", বিনোদবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন; এইমাত্র যে-ব্যক্তিগুলির সহিত ভারতী তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিল তাহারা সকলে যে 'পথের দাবী'র সভ্য, বিনোদবাবু তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু, এই 'পথের দাবী'র উদ্দেশ্ত কি, অপূর্ব্বরই বা ইহাদের সহিত কি সম্বন্ধ, এইসব নানা প্রশ্ন বিনোদবাবুর মনে উদিত হইল। তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন—

শান্তির প্রতিমূর্তি এই ভারতীই বা কে? অপূর্ব যেভাবে ভারতীকে তাহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিল, তাহাতে তাঁহার মনে হইল—ভারতীর সহিত অপূর্বর পরিচয় নূতন নহে এবং তাহাদের পরস্পরের মেলা-মেশা বেশ সহজ, সরল—তাহাতে কোনরূপ দ্বিধা নাই।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিনোদবাবু অপূর্বকে কি-একটা প্রশ্ন করিতে যাইবেন, এমন সময় ভারতী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনারা বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আসুন, চা তৈরী হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু, একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রছি—অপূর্ববাবুর কাছে আগে আপনার সম্বন্ধে যা' পরিচয় পেয়েছি তাতে আমার ছোঁয়া-নাড়া খেতে আপনার কোনো আপত্তি হবে না তা' জানি, কিন্তু আপনার সঙ্গের এই ভদ্রলোকটির?

বিনোদবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "না-না তাতে ওর মোটেই আপত্তি নেই, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ভারতীকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে বিনোদবাবুর কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকিল; কারণ বিনোদবাবু অপূর্ব অপেক্ষা বয়সে প্রায় দশ বৎসরের বড়, তাঁহার বড় মেয়ের বয়স প্রায় বাইশ বৎসর হইতে চলিল। বিনোদবাবু ভারতীকে রাজীব সম্বন্ধে ঐরূপ বলিয়াই পুনরায় ভারতীকে সম্বোধন করিলেন "আচ্ছা, মা! তোমাকে 'আপনি' না-ব'লে আমি যদি 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করি তাতে তুমি অসন্তুষ্ট হবে-না তো?"

ভারতী শান্ত এবং নম্রদৃষ্টিতে বিনোদবাবুর প্রতি চাহিয়া উত্তর করিল,—"আপনি আমাকে প্রথমে 'আপনি' ব'লে সম্বোধন ক'রে সত্যিই আমাকে বড় লজ্জায় ফেলেছিলেন, এইবার 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করায়, আমি আমার সহজ অবস্থায় ফিরে এলাম। আশা করি, আর কখনো ভুলেও আমাকে 'আপনি' ব'লে ডেকে অস্বস্তির মাঝে ফেলবেন

না। যান, আর দেরি ক'রবেন না, শিগ্‌গির হাত-মুখ ধুয়ে নিন, আমি এক্ষুনি চা নিয়ে আসচি।"

এই বলিয়া ভারতী তাহার রন্ধনশালায় গিয়া, সকলের জন্য একটি করিয়া ডিমের পোচ তৈরী করিয়া লইল। মঙ্গল কতকগুলি রুটি টোষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, ডিমের পোচ আর রুটির টোষ্টগুলি প্লেটে সাজাইয়া প্লেটগুলি মঙ্গল টেবিলের উপর রাখিয়া দিলে, ভারতী চায়ের কেট্‌লি লইয়া আসিয়া চা তৈরী করিয়া একে একে সকলের সম্মুখে আগাইয়া দিয়া বলিল, —"আমার তো আর মোটেই জানা ছিল না যে আপনারা আজ সকালে আস্‌বেন, কাজেই তাড়াতাড়ি ক'রে ডিম-রুটি ছাড়া আর কিছু যোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পারিনি, এ-ই এখন খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন, আমি শিগ্‌গির রান্নার ব্যবস্থা ক'রছি।"

ভারতীর কথায় বিনোদবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—না, মা, আমাদের জন্যে তোমাকে অতো ব্যস্ত হ'তে হবে না,—চায়ের সঙ্গে ডিম আর রুটি যোগাড় ক'রেছ, এ-ই যথেষ্ট, যোগাড়ের আর ত্রুটি কোথায় রইল, মা?—কই, তোমার নিজের জন্যে চা নিলে-না?"

ভারতী উত্তর করিল,—"আপনারা খান, আমি তো রোজ চা খাই-না।"

বিনোদবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"না, তা' হবে-না, মা,— আমাদের সঙ্গে তুমি চা না-খেলে, আমাদের খাওয়াই হবে-না।"

অগত্যা ভারতী নিজের জন্যও এক-পেয়ালা চা তৈয়ারী করিয়া লইয়া খাইতে বসিল।

মাতার শ্রাদ্ধ শেষ করার পর হইতে ভারতীর হাতের রান্না খাওয়ার বিষয়ে অপূর্বর আর তেমন আপত্তি দেখা যায় নাই। যদিও সেবিষয়ে ভারতী

পূর্ববৎ সাবধানই ছিল, কিন্তু অপূর্বর নির্দেশক্রমে ভারতী অতি আনন্দের সহিত অপূর্বর জন্য নিজেই রান্না আদি করিয়া লইত।

ভারতী আজ অপূর্বকে নিজের হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। ইহা ভারতীর জীবনে অপূর্বর প্রতি তাহার গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষার মাত্র একটী বিষয়ের সাফল্যলাভ। এই সফলতার আনন্দ আজ ভারতীর অন্তরে ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত। ভারতীর অন্তরের এই পুলক অপূর্বও বাহির হইতে এখনও টের পায় নাই। আজ পুরাতন একটি কথা ভারতীর মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে কোন প্রকারে গোপন-হাসি সংবরণ করিল,—অপূর্ব একদিন ভারতীকে বলিয়াছিল, সে মরিয়া গেলেও ভারতীর হাতের রান্না খাইতে পারিবে না। কিন্তু, আজ?

রেঙ্গুনে আসিয়া ভারতীর আন্তরিক আদর-যত্নে এবং শশীর রচিত নূতন নূতন কবিতা শ্রবণে বিনোদবাবুর শোকাতুর চিত্ত দুই-তিন দিন হইতে বেশ প্রফুল্ল আছে। শশীর নিকট তিনি ভারতীর সকল পরিচয়ই জানিতে পারিয়াছেন, অপূর্বর সহিত ভারতীর পরিচয়ের পর হইতে অপূর্বর প্রতি ভারতীর আন্তরিক ব্যবহার এবং মাতার মৃত্যুর পর একমাত্র ভারতীর সান্ত্বনা ও যত্নের ফলে অপূর্ব সকল শোক-দুঃখ ভুলিতে পারিয়াছে ইত্যাদি বহু বিষয়, ভারতীর সম্বন্ধে, বিনোদবাবু শশীর নিকট শুনিয়াছেন, এমন-কি শশী ভারতীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া ইহাও বলিয়াছে যে, ভারতীর ন্যায় সর্বগুণসম্পন্না আদর্শ নারী আমাদের দেশে বড় একটা দেখা যায় না। কথাগুলি বিনোদবাবুর অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় নাই। কারণ এই কয়দিন ভারতীর সহিত নানা-বিষয়ে আলোচনায় বিনোদবাবু ভারতীর অত্যাশ্চর্য প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া যথেষ্ট মুগ্ধ হইয়াছেন। ভারতী অপূর্বর প্রতি যে বেশ অনুরক্ত তাহাও বিনোদবাবু কথাবার্তায় বুঝিতে পারিয়াছেন।

একদিন অপূর্বর সহিত নদীর ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে বিনোদবাবু হঠাৎ অপূর্বকে বলিতে লাগিলেন—"অপূর্ব, জীবনে আমি অনেক বিষয়ে তোমার প্রতি অনেক অবিচার ক'রেছি, সেজন্য তোমাকে অনেক দুঃখ এবং অসুবিধা ভোগ ক'রতে হ'য়েছে। কিন্তু, তোমার ভবিষ্যৎ-জীবনের সুখ-শান্তির জন্য আমি একটা কাজ সম্পূর্ণ ক'রে যেতে চাই। আমার মনে হয় তাতে তোমার কোনো আপত্তি হবে না।"

অপূর্ব উত্তর করিল,—"কি, বলুন, আজ পর্যন্ত, যে-সব বিষয় যুক্তিযুক্ত বা ন্যায়সঙ্গত ব'লে আমার মনে হয়েছে, সে-সব বিষয়ে, আমি আপনার অবাধ্য হ'য়েছি ব'লে আমার মনে হয় না।"

বিনোদবাবু বলিলেন,—"তা আমি জানি, অপূর্ব! সেইজন্যে আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তোমার মত নেওয়ার আগেই আমি অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছি। অক্টোবর মাস তো শেষ হ'তে চ'ললো, আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি আমি ভারতীর সঙ্গে তোমার বিবাহ সম্পন্ন ক'রতে চাই।"

অপূর্ব বলিল—"এ-বিষয়ে আমিও চিন্তা ক'রেছি, দাদা। ভারতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার পর হ'তে, আমার প্রতি তার আন্তরিক ব্যবহারে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি—ভারতী যদি আমাকে তার স্বামীরূপে লাভ ক'রতে না-পারে, তবে তার জীবন একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। অপর পক্ষে, আমি নিজেও, ইদানীং ভারতীর প্রতি আমার অন্তরের একটা আকর্ষণ বুঝতে পারছি। এ-কথা আমি যদি স্বীকার না-করি, তবে আমি নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা ক'রব। কিন্তু, ভারতীর সঙ্গে আমার বিবাহ কেমন ক'রে সম্ভব তা' আমি বুঝে উঠতে পারছি না।"

বিনোদবাবু বলিলেন, "সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, অপূর্ব, আমি আমাদের সমাজের, এখানকার ব্রাঞ্চের, আচার্যের সঙ্গে দেখা ক'রেছিলাম, তিনি ব্রাহ্ম-মতে ভারতীর সঙ্গে তোমার বিবাহ যেমন ক'রে হোক সমাধা ক'রে দেবেন, সে-ভরসা আমাকে দিয়েছেন।"

সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া অপূর্বর সহিত ফিরিবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই বিনোদবাবু দেখিতে পাইলেন—মুখে অর্ধপক্ক দাড়ি-গোঁফ বিশিষ্ট এক প্রৌঢ়ব্যক্তি তাঁহাদের দিকে আসিতেছেন। উক্ত ব্যক্তি তাঁহাদের নিকটস্থ হইবামাত্র, বিনোদবাবু হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই-যে আচার্য ম'শায়, এইমাত্র আমি আমার ভাইকে আপনার কথা ব'লছিলাম।" অপূর্বকে দেখাইয়া বিনোদবাবু বলিলেন,—"এরই নাম অপূর্ব, আমার ছোট ভাই।"

বিনোদবাবুর ইঙ্গিতে অপূর্ব আচার্যদেবের পাদস্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেই, আচার্য মহাশয় ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "থাক্, থাক্, হ'য়েছে।"

বিনোদবাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"আমি এই কিছুক্ষণ আগে অপূর্বর মত নিয়ে জানতে পারলাম, ভারতীর সঙ্গে বিবাহে ওর কোনই আপত্তি নেই। এখন আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুভ কাজ যাতে শিগ্‌গির শেষ ক'রতে পারি, সে-বিষয়ে এখন হ'তেই আমাদের সব যোগাড়-যন্ত্র ক'রতে হবে। কিন্তু, আচার্য ম'শায়, আমি এখানে সম্পূর্ণ নূতন। একমাত্র আপনিই আমার ভরসা; আমি অপূর্বর বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আপনারই উপর নির্ভর ক'রছি, এ-বিষয়ে যা' বিধি-ব্যবস্থা ক'রবার আপনিই করুন।"

আচার্য মহাশয় বিনোদবাবুকে ভরসা দিয়া বলিলেন—"আমি তো আপনাকে সেই দিনই ব'লেছি যে এ-বিবাহে আপনার ভাইয়ের যদি কোনো আপত্তি না-থাকে তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যে-কোন উপায়ে

নির্দিষ্ট দিনে শুভ কাজ সমাধা ক'রে দেবো। আপনার পিতৃদেব আমাদের সমাজের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারবো-না। আমি চাই যে আপ-নারাও দুই ভাইয়ে সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; পরমপিতার কৃপায় আমাদের পথের সকল বিঘ্ন দূর হ'য়ে যাক—আমাদের সংসারে তাঁর আসনের প্রতিষ্ঠা হোক, কৃপাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।"

পথ চলিতে চলিতে আচার্য মহাশয় অপূর্বকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, —"আমি তোমার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি অপূর্ব! তোমার মাতার সুখ-শান্তির জন্ম তুমি অনেক অসুবিধা সহ্য ক'রেও তাঁদের সব পুরাতন সংস্কারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলেছ।"

আচার্যের কথা শেষ না হইতেই অপূর্ব উত্তর করিল—"সংস্কার কাদের নেই বলুন? আপনারা কি মনে করেন যে আপনারা ব্রাহ্ম-সমাজ-ভুক্ত হওয়ার পর পুরোণো সব সংস্কার হ'তে ছাড়া পেয়ে আর নূতন কোনো সংস্কারে জড়িয়ে পড়েন নি? আমার কথাগুলো হয়তো আপনার রুচিকর হ'চ্ছে না, কিন্তু এটা নিশ্চয়ই জানবেন, আচার্য-ম'শায়, যে আপনারা আপ-নাদের পৈতৃক সমাজের বিধি-ব্যবস্থাগুলোকে সংস্কার সংস্কার ব'লে সেই সমাজের প্রতি মনে অবজ্ঞার ভাব আর বড়-র অহঙ্কার পোষণ ক'রে চিরদিন যদি নিজেদেরকে এ রকম আলাদা ক'রে দেখেন তবে জাতির পক্ষে মঙ্গলকর বা শক্তিমান্ কিছু গ'ড়ে তোলা কোনোদিনই আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।"

বিনোদবাবু অপূর্বর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আহা চুপ কর, অপূর্ব! আচার্যদেব আমাদের যথেষ্ট স্নেহ করেন কি না।"—

বিনোদবাবুর কথা শেষ না হইতেই আচার্য মহাশয় বলিলেন—

"আপনার ভাই ঠিকই ব'লেছে বিনোদবাবু! আজ পর্যন্ত যত ধর্মমত সৃষ্টি হ'য়েছে সেই সব ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজ নিজ ধর্মের কোন-না কোন সংস্কারে আবদ্ধ হ'য়ে আছেই; ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে খুব কম লোককেই সজাগ দেখতে পাওয়া যায়—বাহ্যিক আচার নীতি আর সংস্কার নিয়েই সকলে ব্যস্ত।"

আচার্য মহাশয় ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রকৃত কর্মী এবং অকপট সত্যানুসন্ধী। ইদানীং ব্রাহ্ম-সমাজের প্রসার কেন যে এতো মন্দীভূত হইল সে বিষয়ে তিনি বহু চিন্তা করিয়াছেন; প্রকৃত গলদ এবং ত্রুটি কোথায় তাহাও তিনি বুঝিয়াছেন। তাঁর সেই উপলব্ধির সত্যকারের সুর আজ অপূবর কণ্ঠেও ধ্বনিত হইতে দেখিয়া আচার্য মহাশয় অপূবর প্রতি সন্তুষ্টই হইলেন, তিনি অপূর্বকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠিক ব'লেছ, অপূর্ব! সমাজের সংস্কার সাধন করতে গিয়ে, আজ আমরা শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান-রূপ সংস্কারে জড়িয়ে পড়েছি, তাই আমাদের সমাজের প্রবর্তকদের প্রকৃত উদ্দেশ্য আজ ব্যর্থ হ'তে চলেছে। দেশে এবং সমাজে আজ তোমাদের মতো কতকগুলি নির্ভীক এবং নিরহংকার কর্মীর আবশ্যক। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি—তোমরা কর্মের সব অহংকার হ'তে মুক্ত হ'য়ে মঙ্গলময়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জগতে নূতন বিধান প্রতিষ্ঠা কর—যা হবে স্বচ্ছন্দ, শক্তিমান এবং আনন্দপূর্ণ।"

আচার্যদেবের উক্তরূপ কথায় অপূর্ব মনে বেশ আনন্দ অনুভব করিল। সে আচার্য মহাশয়ের পাদস্পর্শ করিয়া বলিল,—"আপনাদের ন্যায় পূজনীয়-দের আশীর্বাদ আর নির্দেশ আমরা সব সময়েই কামনা করি, আচার্য-ম'শায়, কিন্তু, আপনার মতো এরকম নিরপেক্ষ সমাজ-সেবক এবং প্রকৃত সত্যের সমর্থক খুব কমই দেখা যায়।"

আচার্যদেব অপূর্বর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন,—"বাবা, যা সত্য, তা' চিরদিনই সত্য। কর্ম এবং উদ্দেশ্যের পিছনে যদি সেই অনাবিল সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকে, তবে আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের সমর্থন থাক্ আর না-ই থাক্, তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, 'সত্য' চিরদিনই নিজের পথ নিজেই পরিষ্কার ক'রে এগিয়ে চলে—তার সে-অগ্রগতিকে বাধা দিতে পারে, জগতে তেমন কোনো শক্তিরই বিকাশ আজও হয়নি। তবুও, আমাদের মতো বয়োবৃদ্ধদের আশীর্বাদে এবং সমর্থনে যদি তোমরা তোমাদের কর্মে উৎসাহ পাও, তবে আজ আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাদেরকে আশীবাদ ক'রছি—তোমরা তোমাদের পথের সকল বাধা-বিঘ্ন জয় ক'রে জগতে নূতনের প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হও। আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতি, বিশেষ ক'রে বহুবিভক্ত আমাদের এই বাঙালী সমাজ, পরস্পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগী হ'য়ে একই লক্ষ্যে অগ্রসর হোক্।"

* * *

সেই দিবস, ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে বিদায়কালে, সব্যসাচী অপূর্বকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিল,—"প্রার্থনা করি, সত্যকারের দাতাকে একদিন তুমি যেন চিনতে পারো, অপূর্ববাবু।"

সব্যসাচীর সেই উক্তি বহুবার অপূর্বর অন্তরে ঝংকার দিয়া ভারতীর প্রতি তাহার কর্তব্য সম্বন্ধে অপূর্বকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে সব্যসাচী ভারতীকেও বলিয়াছিল—"অপূর্ববাবুকে নিয়া তুমি সুখী হও—আমি নিশ্চয় জানি তার সকল দ্বিধা সকল সংস্কার ছাপিয়ে তোমার মূল্য একদিন তার চোখে প'ড়বেই প'ড়বে।"

আজ যথার্থই অপূর্ব ভারতীর সত্যকার মূল্য বুঝিয়াছে। ভারতীর সম্বন্ধে অপূর্ব মনে-মনে চিন্তায় এতোদূর অগ্রসর হইয়াছে যে ভারতীকে সুখী

করিবার জন্য যদি তাহাকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিতেও হয় তবে তাহাতে সে দ্বিধা বোধ করিবে না। কিন্তু তাহার মনে পড়িয়া গেল—একদিন সে ভারতীকে বলিয়াছিল—"আমি ধর্মত্যাগ ক'রতে পারি এ আপনি ভাবতে পারেন?" তাহার উত্তরে ভারতী বলিয়াছিল—"পারি"। কিন্তু অপূর্ব জোর দিয়াই বলিয়াছিল যে প্রাণ গেলেও সে ধর্মত্যাগ ক'রতে পারে না। আজ অপূর্ব নিজের এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া মনে মনে লজ্জায় সংকুচিত হইয়া পড়িল। অপূর্ব ভাবিল—তাহা হইলে ভারতীর নিকট তাহার কী ভীষণ পরাজয়ই না হইবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে যখন আর একটা দিক চিন্তা করিয়া দেখিল যে, ব্যক্তিবিশেষের নিকট কোনও বিষয়ের জয়-পরাজয়ে বিশেষ কিছু যায় আসে না। ভারতী যদি তাহাকে স্বামীরূপে লাভ করিতে পারে তবে তাহার জীবন কত বেশী গৌরবোজ্জ্বল হইবে! তখন অপূর্ব মনে অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল। উপরন্তু সে আজ যখন ইহাও জানিতে পারিল যে তাহার দাদা স্বয়ং ভারতীর সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক এবং উদ্যোগী তখন সত্যই অপূর্বর মন হইতে নানা চিন্তার পুঞ্জীভূত মেঘ ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। অপূর্ব আচার্য মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া হৃষ্টচিত্তে বিনোদবাবুর সহিত বাসায় ফিরিয়া আসিল।

অপূর্ব বরিশাল কলেজে যে প্রফেসরীর পদ গ্রহণের সংকল্প করিয়াছিল সে-সংকল্প ত্যাগ করিয়া পুনরায় রেঙ্গুনে বোথা কোম্পানির কার্যে যোগ দেওয়াই স্থির করিয়াছে। সুতরাং আর একমাসের ছুটির জন্য অপূর্ব তাহাদের অফিসে এক দরখাস্ত করিয়াছে।

ইদানীং ভারতী প্রায় প্রত্যহই অপূর্বকে লইয়া প্রাতঃকালে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইত। আজ ভ্রমণে বাহির হইয়া ভারতীকে একটু বিমর্ষ এবং অন্যমনস্ক দেখিয়া অপূর্ব প্রশ্ন করিল—"কি, ভারতী, আজ-যে

তোমাকে কেমন-কেমন লাগ্‌ছে? মুখখানা গম্ভীর, চলার সঙ্গে মনের তেমন সংযোগ নেই—তোমার কি হ'য়েছে, ভারতী?"

ভারতী উত্তর করিল—"কি হ'য়েছে, ব'লবো? কিন্তু ব'লতে যে ঠিক মন সরছে না।—যাক্‌, আপনাকে ব'লেই ফেলি। আজ ভোর-রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম—আমার বাবার একজন বন্ধু ক্রীশ্চান মিশনারী আমার বিয়ের সমস্ত যোগাড় ক'রে ফেলেছে; পাত্রটির চেহারা ভয়ানক কুৎসিত—হাঁড়ির মতো মুখ, নাকটা চেপ্‌টা, যেন একটা জন্তু বিশেষ! আমার একান্ত আপত্তি সত্ত্বেও, তারা একরকম জোর ক'রেই আমাকে বিবাহ-মঞ্চের ওপরে টেনে নিয়ে গেল! এই ব্যাপারে আমি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌তেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।"

ভারতীর স্বপ্নের কথা শুনিয়া অপূর্ব হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হয়-না তাতো জানো? তোমার এ-স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে, ভারতী!"

অপূর্বর কথায় ভারতী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল—"যান, কী-যে বলেন আপনি।"

অপূর্ব আরও জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"আমি ঠিকই ব'লেছি, ভারতী,—কেঁদে উঠে তোমার ঘুম ভেঙে যদি না-যেতো, তবে তুমি আরও দেখতে পেতে—তোমাকে যখন ওরা জোর ক'রে বিবাহ-মঞ্চের ওপরে টেনে নিয়ে গেল, তখন তুমি তোমার বরের সামনে হাজির হ'তেই, সেই কুৎসিত চেহারার জন্তুবিশেষ লোকটি ধীরে ধীরে কোথায় যেন অদৃশ্য হ'য়ে গেল, এবং তার স্থলে এসে দেখা দিল—এই শ্রীল শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার হালদার মহাশয়, আর ক্রীশ্চান পুরোহিতের স্থানে দেখা গেল ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যদেবকে; তার পর যথারীতি অপূর্বকুমার হালদারের সহিত মিস

ভারতী যোসেফের বিবাহ হইয়া গেল এবং কান্নার পরিবর্তে তোমার সারা মুখখানা তখন হাসিতে ভ'রে উঠলো, যদিও সে-হাসি তুমি গোপন ক'রলে —কাউকে জানতে দিলে না।"

ভারতী হাসিয়া বলিল—"বাঃ বেশতো কথা তৈরী ক'রতে শিখেচেন? এইবার একখানা বই লিখে ফেলুন না?

অপূর্ব বলিল—"ঠিক ব'লেছ। আর সেই বইয়ের নাম হবে— 'বিষণ্ণ-ভারতী'—কি বল?"

ভারতী বলিল—"না, আর 'বিষণ্ণ-ভারতী' লিখবার দরকার হবে না; আমার স্বপ্নের শেষ-চিত্র আপনি যে-ভাবে আঁকলেন, তাতেই ভারতীর চিত্ত বেশ প্রসন্ন হ'য়ে উঠেছে। এখন চলুন বাড়ী ফেরা যাক— এদিকে বেলা হয়ে উঠলো।"

অপূর্ব ফিরিবার পথে ভারতীকে বলিল—না, সে তামাসা করিতেছে না—আগামী-মাসের মাঝামাঝি তাহাদের বিবাহ হইবে। তাহার দাদা স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া বিবাহ-কার্য যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় সে-বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন এবং গতকল্য সন্ধ্যার সময় তিনি এ-বিষয়ে তাহার মতও লইয়াছেন। ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অপূর্ব ভারতীর নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করিল।

যেদিন ভারতী অপূর্বর নিকট এই সংবাদ শুনিল, এবং যেদিন বিনোদবাবু ভারতীর মাথায় হাত রাখিয়া সস্নেহে তাহাকে বলিলেন— অপূর্বর জীবনকে সম্পূর্ণ এবং আনন্দময় করিয়া তুলিবার সমগ্র দায়িত্ব তাহারই। সেইদিন কৃতজ্ঞতার সহিত ভারতী নীরবে ভগবানের চরণে শত-সহস্র নমস্কার জানাইল, এবং পুলকিত চিত্তে তাহার জীবনের সবচেয়ে বড়-সৌভাগ্যের দিনটির প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল।

৬

নির্দিষ্ট দিনে ভারতীর সহিত অপূর্বর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের গোলমাল চুকিয়া যাইবার দুই-তিন দিন পরেই বিনোদবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন। রাজীব অপূর্বর নিকট থাকিয়া কোন কাজ-কর্ম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সে আপাততঃ রেঙ্গুনেই থাকিয়া গেল। অপূর্ব রাজীবকে ভরসাও দিয়াছে সে তাহাদের অফিসে যেমন করিয়া হউক রাজীবকে একটি কাজে বহাল করিয়া লইবে।

* * *

ভারতী আজ অপূর্বকে স্বামীরূপে লাভ করায়, সে-যে তাহার জীবনে কত বড় সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে তাহা একমাত্র ভারতীই অন্তরের সহিত উপলব্ধি করিতেছে। এই সৌভাগ্য লাভের পিছনে ছিল—অভীষ্টবস্তু লাভের প্রতি তাহার সমগ্র সত্তার উজ্জল এবং অটুট বিশ্বাস। পিতৃ-মাতৃহীনা হওয়ার পর একমাত্র অপূর্বকে ছাড়া নির্ভরযোগ্য আর কোন অবলম্বনই সে সম্মুখে পায় নাই। তাই সে অন্তরে অন্তরে নিজেকে অপূর্বর নিকট এরূপ একান্তভাবে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিল।

এই আত্ম-নিবেদন কি শুধু ভারতীই অপূর্বর নিকট করিয়াছিল? ভারতীর এই অনুরাগ কি অপূর্বর অন্তরে আসন বিস্তার করিয়া বসে নাই? —ভারতীর সহিত পরিচয়ের পর হইতেই অপূর্বর অন্তর তাহার অগোচরে ক্রমশঃ ভারতীকে অতি একান্তভাবে আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাই তো সেদিন তেওয়ারীর অসুখের সময় অপূর্ব যখন নিজেও অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন অপূর্ব ভারতীকে বলিয়াছিল—"দু'জনের মধ্যে

একজন তাহার নিকটে না-থাকিলে চলিবে না, হয় তাহার মা না-হয় ভারতী।" আর-একদিন, অপূর্ব ভারতীর বাসায় অবস্থানকালে, ভারতী যখন তাহাকে বলিয়াছিল—হোটেলে তাহার শোয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তখন অপূর্ব বলিয়া বসিয়াছিল—তাহা হইলে সে ভারতীর বিছানার চাদর লইয়া যাইবে, কারণ, পরের বিছানায় সে কিছুতেই শুইতে পারিবে না।

অপূর্ব-ভারতীর অন্তরের এই গূঢ় কথা দ্বিতীয় যে-একব্যক্তি জানিতে পারিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন—সব্যসাচী। তাইতো সেইদিন সব্যসাচী হোটেল হইতে ছদ্মবেশে ভামোয় যাইবার সময় অপূর্ব যখন সব্যসাচীকে প্রণাম করিয়াছিল, তখন সব্যসাচী একই সঙ্গে অপূর্ব-ভারতীর মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সব্যসাচীর সেই আশীর্বাদ সত্যই সফল হইয়াছে।

অপূর্ব তলোয়ারকরকে ভুলিতে পারে নাই। তলোয়ারকর যেদিন আহত অবস্থায় পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া, জেল-হাঁসপাতালে স্থান পাইল, তাহার পরের দিন হইতেই ভারতীকে সঙ্গে লইয়া, অপূর্ব প্রত্যহ হাঁসপাতালে যাইয়া তলোয়ারকরকে দেখিয়া আসিত। ভারতী যে-সময়টুকু হাঁসপাতালে থাকিত সেটুকু সময় সে নিজে তলোয়ারকরের সেবা-শুশ্রূষায় রত থাকিত। ইহা ব্যতীত ভারতী নিজ ব্যয়ে একটি নার্স ও সর্বক্ষণের জন্য তলোয়ারকরের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিল।

ভারতীর তত্ত্বাবধানে এবং ব্যবস্থায় তলোয়ারকরের সুচিকিৎসা হওয়ায়, সে ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু, তলোয়ারকরের মনে এই দুশ্চিন্তা লাগিয়াই ছিল যে, সে আরোগ্যলাভ করিলেই তাহাকে জেলে পচিতে হইবে। সুতরাং অত্যাচার-পীড়িত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ছিল। তলোয়ারকর একদিন অপূর্বকে বলিয়াছিল যে,

তাহারা বৃথাই তাহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু অপূর্ব তলোয়ারকরকে ভরসা দিয়া বলিয়াছিল যে, সে তাহাকে জেল হইতে বাচাইবার সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। অপূর্ব তাহাদের অফিসের বড় সাহেবের নিকট এ-বিষয়ে সাহায্য চাহিয়াছিল। বড় সাহেবকে সে বুঝাইয়া বলিয়াছিল যে, তলোয়ারকর তাহাদের অফিসের একজন পুরাতন এবং অভিজ্ঞ কর্মচারী, সুতরাং তাহাকে জেলমুক্ত করিয়া পুনরায় অফিসের কার্যে নিয়োগ করিলে তাহাদের অফিসের কাজের বিশেষ সুবিধা হইবে। অপূর্বর কথায় বড় সাহেব সম্মত হইয়া তলোয়ারকরকে জেল হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—পুলিস কর্তৃপক্ষ রাজি হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তলোয়ারকরকে মুক্তি দিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে লিখিয়া দিতে হইবে যে, সে তাহার জীবনে আর কখনও কোন প্রকার বিদ্রোহমূলক কার্যে যোগ দিবে না।

তলোয়ারকরকে মুক্তি দেওয়া বিষয়ে পুলিস কর্তৃপক্ষের উক্তরূপ সর্ত্ত সম্বন্ধে অপূর্ব তলোয়ারকরকে জানাইয়াছিল। কিন্তু তলোয়ারকর তাহাতে অপূর্বকে বলিয়াছিল—বিদ্রোহই তাহার জীবনের ব্রত; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সুবোধ শিশুর মতো জেলমুক্ত হওয়ার চেয়ে বিদ্রোহীরূপে জেলে আবদ্ধ থাকাকে সে ঢের বেশী পৌরুষের মনে করে। অপূর্ব তাহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিল, জেলে আবদ্ধ থাকিলে কোন দিনই তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে না। বরং জেলের বাহিরে থাকিয়া তাহারা নানা উপায়ে বহু কাজ করিতে পারিবে। কিন্তু, তথাপি পুলিসের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে অপূর্ব তলোয়ারকরকে রাজি করাইতে পারে নাই।

আর দুই চারিদিনের মধ্যেই তলোয়ারকর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ

করিবে। সেদিন অপূর্ব তলোয়ারকরকে দেখিয়া ভারতীর সহিত হাঁসপাতাল হইতে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একজন পুলিস কর্মচারী আসিয়া তলোয়ারকরকে একটি চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানি উর্দ্ধতন পুলিস কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আসিয়াছে। চিঠিখানির সংক্ষিপ্ত মর্ম নিম্নলিখিতরূপ ঃ

"শ্রীযুক্ত রামদাস তলোয়ারকরের উপর পুলিসের যে-সব অভিযোগ ছিল, তাহা অদ্যকার তারিখ হইতে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। সুতরাং রামদাস তলোয়ারকর এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। আরোগ্যলাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে সে স্বগৃহে গমন করিতে পারে।"

চিঠি পড়িয়া সকলে একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু, অপূর্ব এবং ভারতী মনে মনে যথেষ্ট আহ্লাদিত হইয়া তলোয়ারকরকে জানাইল—আগামী পরশ্ব গাড়ী লইয়া আসিয়া তাহারা তলোয়ারকরকে বাড়ী লইয়া যাইবে। কিন্তু তলোয়ারকর সম্বন্ধে পুলিস কর্তৃপক্ষের হঠাৎ এইরূপ মত-পরিবর্ত্তনের কারণ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। কাহার চেষ্টায় এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, তাহা আপাততঃ তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাতই রহিয়া গেল।

৭

মহেশপুরের ধনী ব্যবসায়ী তারিণী মজুমদারের মৃত্যুর পর তাহার একমাত্র পুত্র রমণী মজুমদার তাহার পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র মালিক। বাপের রোজগারের অর্থ হাতে আসিলে, অধিকাংশ যুবকদের চরিত্রে যে-সব দোষ আসিয়া জুটে, যুবক রমণী মজুমদার সে-সব পুরা-মাত্রায় লাভ করিয়াছিল। কারণ স্ফূর্তি এবং আমোদ করিয়া কি করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হয়, সে-বিষয়ে পরামর্শ দিবার লোকের অভাব হয় নাই—পাড়ার বিলাসী এবং অকর্মণ্য যুবকদের নিকট রমণীমোহন সেবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য এবং উপদেশ পাইয়াছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর রমণী মজুমদারের মাতা সংসারের খুঁটি-নাটি সব ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, মন্দিরে বিগ্রহের সেবা এবং পূজার্চনা লইয়া অধিকাংশ সময় মন্দিরবাটীতেই অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার বড় মেয়ে বিরজাবালা বিধবা হইয়া তাঁহার সংসারেই বাস করিতেছে, বর্তমানে সে-এই সংসারের কর্ত্রী। সমস্ত কাজ-কর্ম দেখা-শুনা, তত্ত্ব-তল্লাস যা-কিছু করিতে হয়, বিরজাই সব করে। জমীদার রেবতীমোহনের গ্রামেই, জমীদারের এক নিকট আত্মীয়ের সহিত বিরজার বিবাহ হইয়াছিল, সেই হইতে রেবতীমোহনের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয়। ভ্রাতার চরিত্র সংশোধনের আশায় বিরজা নিজে উদ্যোগী হইয়া জমীদার-কন্যার সহিত ভ্রাতার বিবাহ দিয়া সুন্দরী বৌ ঘরে আনিয়াছে। বিরজার প্রৌঢ়া মাতা সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক না-রাখিলেও তাঁহার এই নব পুত্রবধূটির প্রতি তিনি বেশ একটু নজর রাখিয়াছিলেন।

পাড়ার পাঁচ বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া বৌ দেখিয়া যাইতেছে। কেহ বলিতেছে, এমন সুন্দরী মেয়ে বড় দেখা যায় না, কেহ বলিতেছে আহা, মেয়ে তো নয়, যেন সোনার প্রতিমা! কিন্তু, সকলের মনেই কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া! মনের কথা প্রকাশ্যে কাহারও কিছু বলিবার উপায় নাই। তথাপি যে যাহার বিশ্বাসের পাত্র সম্মুখে পাইতেছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট কানাঘুষা করিতেছে—"এমন সোনার প্রতিমার ভাগ্যে এই ছিল গা? একটা লম্পট মাতালের হাতে ওকে প'ড়তে হ'ল!—ওর বাপ-মা কি কিছুই খোঁজ-খবর রাখে না?" উত্তরে আর একজন বলে—"কে খবর দেবে বলো? যে খবর দেবে, টের পেলে তো তার আর নিস্তার নাই!"···কারণ তারিণী মজুমদারের নিকট ঋণের দায়ে দেশের অধিকাংশ লোকেরই মাথা বিকাইয়া আছে।

অরুণা এই প্রথমবার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। বিবাহের পর স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে এর-তার নিকট সে কিছু কিছু শুনিয়াছিল। মানব-চরিত্রের যে-সব দোষ-ত্রুটিকে অরুণা একান্ত ভাবেই ঘৃণা করিত, তাহার প্রায় সবগুলিই স্বামীর চরিত্রে বর্তমান ছিল। অরুণা তাহার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই তাহার পিতার আদেশে ও ব্যবস্থায় স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে। কিন্তু এইরূপ ঘৃণ্য চরিত্রের ব্যক্তির কবল হইতে মুক্ত হইবার শেষ পন্থাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছে এবং সেজন্য অরুণা প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। তবে নিতান্ত প্রয়োজন না-হইলে সে হঠাৎ চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না। কারণ অরুণা তাহার রাজীবদা'র নিকটেই শিখিয়াছে যে, জীবনের সকল বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরিয়া মনে প্রাণে ভগবানের শরণ লইলে, ভগবান মানুষকে বিপদ হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা করেন।

আজ অরুণার কেবল রাজীবকেই মনে পড়িতেছে। তাহার সম্বন্ধে

তাহার রাজীবদা'র কত উচ্চ আশাই না ছিল। রাজীবদা' তাহাকে প্রায়ই বলিত—"অত্যাচার এবং উৎপীড়নের হাত হ'তে সমাজকে রক্ষা ক'রতে হ'লে, সমাজের ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিষ্কলুষ এবং শক্তিমান ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে।" অরুণা বড় হইয়া রাজীবের ঐসব কথা নিজেও বুঝিয়াছিল এবং তাহারা মনে মনে সংকল্পও করিয়াছিল—জাতির এবং সমাজের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিবে; এবং তাহাদের জীবনের ব্রত সফল না হওয়া পর্যন্ত তাহারা কেহ বিবাহ করিবে না। অরুণা তাহার বন্ধু বিমলাকে দেখিয়াছে—বিমলার বিবাহ না-হওয়া পর্যন্ত সে কেমন স্বাধীন ছিল, খেলা-ধূলায় কত তাহার উৎসাহ, মনের কেমন স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তি! কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর বিমলা আর সে-বিমলা নাই, তাহার সব স্বাধীনতা কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছে।

অরুণা কেবলই ভাবিতেছে—তাহার আজ এ কী হইল! কৈশোরে পদার্পণ করিয়া জীবনে সে যে-সব সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার সেই সব সংকল্প এবং মনের কত সব উচ্চ আশা যেন মাটির খেলা-ঘরের মতই ভাঙিয়া গেল!

অরুণা তাহার জীবনের বর্তমান এইরূপ অপ্রীতিকর এবং অবাঞ্ছিত পরিণতিতে সাময়িকভাবে অনেকটা মুসড়াইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সে নিজেকে কিছুটা সাম্‌লাইয়া লইল। ভিতর হইতে কে যেন তাহাকে বলিল—"অপেক্ষা কর, ধৈর্য ধর, এ-জীবন বৃথা যাইবে না। ইহারও প্রয়োজন আছে।"

ভ্রাতার বিবাহ দিয়া বিরজা সুন্দরী বৌ ঘরে আনিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নেশাখোর ভাই বৌয়ের সহিত কখন কি ব্যবহার করিয়া বসে, সে-বিষয়ে একটা দুশ্চিন্তা বিরজার মনে লাগিয়াই ছিল। ঘরে সুন্দরী বৌ

আসা সত্ত্বেও রমণীমোহন তাহার অভ্যাস ম'ত প্রত্যহ অধিক রাত্রি করিয়াই বাড়ী ফিরে, বৌয়ের সহিত তাহার কোন পরিচয়ই এযাবৎ হয় নাই, নেশায় বেহুঁস অবস্থায় রাত্রে বৈঠকখানাতেই পড়িয়া থাকে। সেদিন সন্ধ্যার সময় বিরজা তাহার ভ্রাতাকে বাটীর বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল—সে যেন আজ বাড়ী ফিরিতে বেশী রাত্রি না-করে।

রাত্রির আহারাদি শেষ করিয়া অরুণা তাহার শয়নকক্ষে একটি চেয়ারে বসিয়া কি একটি বই পড়িতেছিল, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে, এমন সময় রমণীমোহন মদের নেশায় টলিতে টলিতে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অরুণা যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। রমণীমোহন জড়িতকণ্ঠে অরুণাকে প্রশ্ন করিল—"কি-বই পড়া হ'চ্ছে? পড়াতে যে খুব মগ্ন দেখ্‌ছি, আমাকে ঘরে ঢুক্‌তে দেখে যে একেবারেই গ্রাহ্য নেই,—কি-বই দেখি—"এই বলিয়া বইখানি অরুণার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া দেখিয়া বলিল—"ও, মীরা বাঈএর জীবনী পড়া হ'চ্ছে? আমার সংসারে কিন্তু এ-সব বই-টই পড়া চ'ল্‌বে না।" এই বলিয়া বইখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

অরুণার ইহা সহ্য হইল না, সে একটু রাগত ভাবেই বলিয়া ফেলিল,—"নেশাখোর লোকের আমার ঘরে ঢুকবার বা আমার কাজে বাধা দেবার কোন অধিকার নেই—নেশাখোর মাতালকে আমি ঘৃণা করি।—স'রে যাও আমার সাম্‌নে থেকে!"

এতো বড় অপমানজনক কথা রমণীমোহন ইতিপূর্বে কাহারও নিকট কখন শুনে নাই। অরুণার কথায় ক্রোধে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল—"কি, আমার ঘরে ব'সে এতো বড় স্পর্দ্ধা, আমি নেশাখোর, মাতাল?—বটে, বেরোও আমার ঘর থেকে!" এই বলিয়া

অরুণার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া, সজোরে তাহাকে এক ধাক্কা দিল। অরুণা সে-ধাক্কা সাম্‌লাইতে পারিল না—ছিট্‌কাইয়া গিয়া দরজার উপরে পড়িল এবং মাথায় আঘাত পাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গিয়া জ্ঞান হারাইল।

শব্দ শুনিয়া বিরজা ছুটিয়া আসিয়া দেখিল—তাহাদের নূতন বৌ মূর্চ্ছিতা অবস্থায় দরজার নিকট মেঝেয় পড়িয়া আছে এবং রক্তে তাহার মাথার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া বিরজা চীৎকার করিয়া উঠিল—"ও গো সর্বনাশ হ'য়েছে, কে আছ, শিগ্‌গির জল আর পাখা নিয়ে এসো।" এই বলিয়া অরুণার নিকট বসিয়া তাহার মস্তকটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিল। পরক্ষণেই বিরজার মেয়ে আসিয়া অরুণার মুখে জলের ছিটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষতস্থানে একটু আইডিন দিয়া বিরজা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। ক্ষত তেমন বেশী হয় নাই, সামান্য একটু কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ এইরূপে শুশ্রূষা করায় অরুণার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যে অরুণার শ্বাশুড়ী আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন. তিনি অরুণাকে তুলিয়া নিজের বুকের মাঝে লইয়া সস্নেহে বলিলেন,—"এসো, আমার মা লক্ষ্মী,—এই শেষ, ও-নরপশুর কবলে আর আমি তোমায় প'ড়তে দেবো না।—কই সে বাঁদরটা ?"

বিরজার মেয়ে বলিল,—"মামা ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে পালিয়েছে।"

"যাক্, সে যেন আর আমার বাড়ীতে না-ঢোকে।" এই বলিয়া অরুণার শ্বাশুড়ী অরুণাকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরবাটীর দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে অরুণা তাহার শ্বাশুড়ীকে বলিল—"দোষ তো তাঁর নয় মা, দোষ আমারই, আমি পুরুষের অহংকারে আঘাত দিয়ে কথা ব'লেছিলাম—ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"তুমি ওকে পুরুষ ব'ল্‌ছো, মা?—যাদের খেয়ালের ওপর কোন সংযম নেই, প্রবৃত্তির পেছনে যারা ছুটে চলে, তারা আবার পুরুষ?—মানুষের শরীর নিয়ে ওরা পশুরও অধম!—না, মা, আর আমি তোমাকে ও-হতভাগার হাতে ছেড়ে দেবো না,—চলো, তুমি আমার বুক আলো ক'রে আমার কাছে থাক্‌বে, চলো।—মনে কিছু কোরো না মা, আমার মেয়েটা বড় ভুল ক'রে ফেলেছে।—জানি না,—মা-জগদম্বা তাঁর কোন মঙ্গল ইচ্ছা পূরণ করতে তোমাকে আমার সংসারে পাঠিয়েছেন।"

ঠাকুর-বাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গনের দুই প্রান্তে দুইটি বিরাট মন্দিরের একটিতে 'রাধামাধব' এবং অপরটিতে 'রাজরাজেশ্বরী'র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। প্রাঙ্গনের পশ্চিম প্রান্তে একটি বৃহৎ দ্বিতল দালান এবং পূর্ব দিকে একটি পুষ্করিণী সহ সুসজ্জিত পুষ্পোদ্যান।

তারিণী মজুমদারের পিতৃপুরুষেরাই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তির অধিকাংশই 'ঠাকুরসেবা'য় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, এবং স্বামীর অবর্তমানে সংসারের কুলবধূরা যাহাতে স্বাধীনভাবে দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুর-সেবার কাজে ব্যবহার করিতে পারেন, সেরূপ ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। তারিণী মজুমদারের মৃত্যুর পর, তাহার বিধবা পত্নী কাত্যায়নী দেবীই হইতেছেন বর্তমানে মন্দিরের একমাত্র সেবাইত।

তারিণী মজুমদার তাহার নিজের জীবনেও বহুবিধ ব্যবসায়ে এবং মহাজনী কারবারে সুদে টাকা খাটাইয়া বহু অর্থ উপার্জন করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার এই অর্থ উপার্জন হইয়াছিল—নানা প্রকার অসৎ পন্থা অবলম্বন করিয়া এবং বহু দরিদ্রের রক্ত শোষণ করিয়া। একবার কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার তৈজস পত্র, অলঙ্কারাদি বা কোনো সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া তারিণী মজুমদারের নিকট টাকা কর্জ লইলে, বন্ধকী জিনিষ বা সম্পত্তি

ফিরিয়া পাইবার আশা তাহাকে চিরতরে ত্যাগ করিতে হইত। এইরূপে তারিণী মজুমদারের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া কত মধ্যবিত্ত এবং কত দরিদ্রকে যে পথে বসিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু যেদিন তারিণী মজুমদারের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী কাত্যায়নী দেবী তাহার সংসারে আসিলেন, তাহার পর হইতে গ্রামের বহু দরিদ্র তারিণী মজুমদারের শোষণের কবল হইতে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা পাইল।

মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তির এতো দিন বিশেষ কোনই সদ্ব্যবহার হয় নাই। কাত্যায়নী দেবী আসিয়া মন্দিরে প্রত্যহ কিছু কিছু দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু তাহার বেশী তিনি আর কিছু করিতে পারেন নাই, তবে স্বামীর অগোচরে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, এই মাত্র।

স্বামীর মৃত্যুর পর টাকা-কড়ির লেন-দেন এবং ব্যবসা পরিচালনার কর্তৃত্ব পুত্রের হাতে চলিয়া গেল। মাতার সহিত পুত্রের তেমন বনিবনাও ছিল না, পুত্র কোন কাজেই মায়ের যুক্তি পরামর্শ লইয়া চলিত না। তাহার উপর স্বামী-বিয়োগের পর কাত্যায়নী দেবীর মনের অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না, কাজেই তিনি সংসার হইতে সরিয়া আসিয়া ঠাকুর-সেবা এবং ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ লইয়া শান্তিতে দিনাতিপাত করিতেছিলেন।

কাত্যায়নী যেদিন সর্বপ্রথম তাঁহার নব-পুত্রবধূ অরুণাকে দেখিলেন, সেইদিনই তিনি বুঝিলেন—এই মেয়েটি সাধারণ মেয়ে নয়, মেয়েটি যেন লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা। সেইদিন তিনি ভাবিলেন, এই মেয়ের কল্যাণে যদি তাহার পুত্রের মতি-গতি ফিরে তবে তাহার স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থের একটা সদ্ব্যবহার হইবে এবং পুত্রের জীবনের গতিও সৎপথে ফিরিবে।

মন্দিরবাটীতে আসিয়া শাশুড়ীর স্নেহ-যত্নে কিছুদিন বাস করার পর,

অরুণা বুঝিতে পারিল, তাহার এই শাশুড়িটির স্থান সংসারের আর স মেয়েদের অনেক উর্ধ্বে। চিত্তের এইরূপ উদারতা, প্রাণের এইরূপ দরদ অরুণা খুব কম মেয়েরই দেখিয়াছে। এইরূপ দরদী এবং স্নেহময়ী শাশুড়ী সংস্পর্শে আসিয়া অরুণার মনের অবসাদ ও ক্ষোভ অনেকটা প্রশমি হইল। মন্দিরের বিগ্রহের জন্য ফুলের মালা গাঁথা ইত্যাদি কাজ লইয় অরুণার দিন কতকটা স্বস্তির মধ্যেই কাটিতে লাগিল। পাড়ার গরীব-দুঃখ এবং গৃহস্থ যারাই একবার অরুণার সংস্রবে আসিল, অরুণার রূপে-গুণে এব কথাবার্তায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল—"এইবার সত সত্যই মায়ের মন্দিরে সাক্ষাৎ মা রাজরাজেশ্বরীর আবির্ভাব হইয়াছে।"

এদিকে অরুণার পিতা জমীদার রেবতীমোহন অরুণাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার জমিদারী সংক্রান্ত কোনও কাজে স্থানান্তরে গিয়া ছিলেন। সপ্তাহকাল পরে বাটী ফিরিয়া তিনি বিরজার এক পত্র পাইলেন পত্রে বিরজা অরুণার প্রতি তাহার ভ্রাতার আচরণের বিষয় সমস্তই খুলিয় লিখিয়াছে। কারণ রেবতীমোহনকে বিরজা ভালরূপেই জানে, সুতরা এ-বিষয় গোপন করিলে বিরজাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে, এ কথা চিন্তা করিয়া সেদিনকারের ঘটনা অরুণার পিতার গোচরে আনা বিরজা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল এবং পত্রে সে ইহাও লিখিয়া দিল—শীঘ্র লোক পাঠাইয়া অরুণাকে লইয়া গিয়া যেন নিজবাটীতে এখন কিছুদিন রাখেন

পত্র পড়িয়া রেবতীমোহন একেবারে অগ্নিশর্মা হইলেন এবং অরুণাকে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মহেশপুরে লোক পাঠাইলেন।

* * *

বিবাহিতা মেয়েদের অন্তরে স্বামীভক্তি এবং স্বামীর প্রতি তাহাদে প্রাণের যে একটা আকর্ষণ সাধারণত দেখা যায়, অরুণার অন্তরে তাহা

স্বামীর প্রতি সে-ধরণের কোনও ভাব পুষ্টিলাভ করে নাই বটে, কিন্তু অরুণা তাহার নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম এবং বৃত্তিকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। নির্যাতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা এবং বিপথগামী ব্যক্তিদের সৎপথে ফিরাইয়া আনার যে-সব ব্রত তাহারা একদিন জীবনে গ্রহণ করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল, তাহাও অরুণা ভুলিতে পারে নাই। সুতরাং অরুণা তাহার স্বামী রমণী মজুমদারকে এইরূপ পঙ্কিল জীবন যাপন করিতে দেখিয়া ভাবিল—এই ব্যক্তিটিকে কি সৎপথে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের সংসারে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করা যায় না? অরুণা তাহার এই সংকল্প তাহার শাশুড়ীমাতার নিকট একদিন ব্যক্ত করিল। কিন্তু কাত্যায়ণী দেবী অরুণাকে বলিলেন—"সে-চেষ্টার আমরা কোন ত্রুটি করিনি মা,—সেইজন্যই তোমার ম'ত লক্ষ্মী-মেয়েকে আমরা ঘরে নিয়ে এসেছি। কিন্তু তাতে কি হলে না,—পতঙ্গের যখন মরণের সময় ঘনিয়ে আসে, ঘুরে ফিরে তখন সে ঐ জ্বলন্ত শিখার ওপরে গিয়েই উড়ে পড়ে। তা' নইলে, সেদিন তোমার ও-রকম দুর্দশা ঘটিয়ে, বাড়ী হ'তে পালিয়ে গিয়ে, হতভাগা সেই-যে বাগান-বাড়ীতে আড্ডা নিয়েছে, আর এদিক পানে ফিরেও চায়নি। শুনলাম, তার স্ফূর্তির মাত্রা নাকি আরও বেড়েচে। ম্যানেজার সেদিন কিছুতেই ওকে টাকা দেবে না, সেই রাগে ছোরা বের ক'রে হতভাগা নাকি ম্যানেজারকে খুন ক'রতে যায়! কি করবে, বাধ্য হ'য়ে তখন ম্যানেজারকে সিন্দুকের চাবি ফেলে দিতে হ'য়েছে।···ভেবে আর কি ক'রবে মা, আমি ইদানীং ওর আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি,—ছেলে ভেবে আর কি ক'রব?—কে কার ছেলে, কে কার স্বামী?—যিনি জগতের স্বামী, তাঁকেই যদি এ-জীবনে লাভ ক'রতে পারা যায়, তবেই ছেলে, স্বামী সবই পাওয়া যায়। রাসলীলার সময় ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদেরকে পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে যখন ব'লেছিলেন,

—"তোমরা কুলবধূ, পতিই তোমাদের ধর্ম-কর্ম সব। সুতরাং স্বামী ত্যাগ ক'রে, এই গভীর নিশীথে এখানে আমার কাছে আসা তো তোমাদের উচিৎ হয়নি?' শ্রীকৃষ্ণের সেই কথার উত্তরে গোপীরা যা' ব'লেছিলেন, জানো তো, মা?—শ্রীকৃষ্ণকে তখন গোপীরা ব'ল্লেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি হ'চ্ছ পতির পতি 'পরমপতি', তুমি প্রত্যেক জীবের আত্মায় আত্মায় রমণ কর, তুমি 'আত্মারাম'। সুতরাং আমাদের পতির আত্মায় যতক্ষণ তোমার অধিষ্ঠান, ততক্ষণই আমাদের পতির অস্তিত্ব, অতএব একমাত্র তোমাকেই যখন আমরা লাভ ক'রতে পারি, তখনই প্রকৃতরূপে আমাদের পতি পুত্র সবই লাভ হয়।"

"বুঝলে তো মা?—কত জন্মের কত কঠোর তপস্যা ও সাধনার বলে দ্বাপরযুগে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেদেরকে পূর্ণভাবে সমর্পণ ক'রতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমে ও ভক্তিতে গোপীদের অন্তর যখন একেবারে নির্মল ও স্বচ্ছ হ'য়ে গিয়েছিল, তখন প্রত্যেক গোপীই তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণকে মূর্ত হ'য়ে উঠ্‌তে দেখেছিলেন।—এই হ'চ্ছে রাসমঞ্চে প্রত্যেক গোপীর সঙ্গে এক-শ্রীকৃষ্ণের পৃথক পৃথক ভাবে নর্তন। শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা একদিনের জন্যই হয়নি মা,—আমাদের অন্তর-জগতে মধুর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের এই নর্তন ও বংশীধ্বনি অনন্তকাল ধ'রে হ'য়ে চলেছে। জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় আমাদের মন-প্রাণ-দেহের সব কালিমা যখন একেবারে ধুয়ে যায়, জগতের কোন কোলাহলই যখন আর আমাদের কানে পশে না, আমাদের অন্তরাত্মা প্রেমে ও ভক্তিতে আপ্লুত হ'য়ে একমাত্র কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্যই যখন আকুল হয়, তখনই আমরা দেখ্‌তে পাই আমাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত বিকাশ, তখনই আমরা শুন্‌তে পাই কৃষ্ণের সেই মধুর বংশী রব। এইভাবে কৃষ্ণকে লাভ ক'রতে না-পারলে আমাদের

এই মানব-জন্মের কোন সার্থকতাই হয় না মা, কাজেই আমাদের মন-প্রাণ-দেহ একমাত্র ঐ কৃষ্ণের চরণেই সঁপে দিতে হবে, একমাত্র তাঁরই সঙ্গে সকল সম্বন্ধ পাতাতে হবে।"

অরুণা তাহার শ্বাশুড়ীমাতার কথাগুলি একেবারে স্থির হইয়া বসিয়া খুব আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল। কাত্যায়ণী দেবী বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"সংসারে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যতসব সম্বন্ধ, এ-সব দেহ মন-প্রাণেরই সম্বন্ধ। আর এ-সব সম্বন্ধের স্থায়িত্ব ততক্ষণই, যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থের অনুকূলে পরস্পরের আদান-প্রদান চলে। এই এখন হয়তো দেখছো—একজন একজনকে কত ভালবাসছে, শ্রদ্ধা ক'রছে, যেই একটু কোথাও কোন স্বার্থের হানি হ'য়েছে বা কোথাও কোন মতের একটু গড়মিল হ'য়েছে, অমনি দেখবে তার সব ভালবাসা, সব শ্রদ্ধা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে! কাজেই, যতক্ষণ না আমরা ভগবানকে ভালবাসতে পারবো, ততক্ষণ মানুষের সঙ্গে আমাদের সত্যকারের ভালবাসা কোনদিনই হবে না। কাজেই কি হবে মা স্বামী, ছেলে ভেবে?—তবে তুমি তোমার কর্তব্য হিসেবে তোমার স্বামীকে সৎপথে ফেরাবার চেষ্টা ক'রতে চাও, তা' ক'রে দেখতে পার, কিন্তু আমি জানি—চেষ্টা ক'রে কোন ফল হবে না, মা,—চেষ্টা আমরা যথেষ্টই ক'রেছি, তার জন্যে আমাদের বিরজাকে কি ঐ হতভাগাটার হাতে কম লাঞ্ছনা সহ্য ক'রতে হ'য়েছে? কেউ কাউকে সৎপথে ফেরাতে পারে না, মা, যদি না সে নিজে নিজের গলদ বুঝতে পেরে নিজে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। তুমি আমি কি ক'রতে পারি, মা, এক জগৎজননী মায়ের কাছে প্রার্থনা জানান ছাড়া? মা জগদম্বার যে কি ইচ্ছা, তিনিই জানেন।" এই বলিয়া অরুণার শ্বাশুড়ী দেবী-মন্দিরের প্রতি করযোড়ে প্রণাম নিবেদন করিলেন।

কিশোর বয়স হইতেই অরুণার মনে, "জগতে এইসব হেঁয়ালী কে সৃষ্টি ক'রলো, মানব-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা কিসে" এইসব নানা প্রশ্ন জাগিয়াছে। তাহার ঐসব প্রশ্নের উত্তর রাজীবের নিকট অরুণা কিছু কিছু পাইত বটে, কিন্তু অরুণা আজ তাহার শ্বাশুড়ীমাতার নিকট যে-সব কথা শুনিল তাহাতে অরুণার অন্তর যেন এক অপূর্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল—অরুণা যেন আজ তাহার জীবন-যাত্রায় এক নূতনতর পথের ইঙ্গিত পাইল।

"মা অরুণা, আমার কাছে এসে বোস্ মা!" রোগ-শয্যায় শায়িত জমিদার রেবতীমোহনের কাতর আহ্বানে অরুণা চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিল। অরুণার মুখের প্রতি চাহিয়া রেবতী-মোহন অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে আবেগে বলিয়া উঠিলেন—"বড় ভুল ক'রে ফেলেছি, মা. আমাকে ক্ষমা করিস্,—বোধ হয় এ-যাত্রা এই শেষ!"

অরুণা পিতার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ভারি-গলায় বলিল,—"ছিঃ, ও-কথা মুখে এনো না, বাবা! কেন অতো ভাবছ? ঠিক ম'ত চিকিৎসা হ'চ্ছে, আমরা সবাই তোমার সেবা-যত্ন ক'রছি, তোমার এমন কি হ'য়েছে যে ও-সব কথা ব'লছ?—ঐ-যে মা আস্ছে। এরই মধ্যে খাওয়া হ'য়ে গেল বুঝি? আমার মনে হয়, তুমি কিচ্ছু খাওনি, মা?"

"হ্যাঁ, মা, খেয়েছি।" এই বলিয়া সৌদামিনী স্বামীর পায়ের দিকে বসিলেন। রেবতীমোহন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ও-রে মা, চিকিৎসা ক'রে কি কেউ কখন কাউকে আয়ু দিতে পারে রে!—উঃ, কি নিষ্ঠুর আমি, আমার অবলা মার জীবনটাকে এতো বড় একটা নিরানন্দের মাঝে ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম!—মাকে যদি আমার এক দিনের জন্যও সুখী দেখে যেতে পারতাম—"

অরুণা পিতাকে এইরূপ অনুশোচনাপূর্ণ উক্তি করিতে দেখিয়া বলিল—

"তুমি কেন এ-সব কথা ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছ, বাবা! আমার তো কোনো দুঃখই নেই,—ভগবান যার উপর সদয়, তার আবার দুঃখ কিসের? অমন দেবীর ম'ত শাশুড়ী যার, তার কিসের কষ্ট, বাবা?—

তুমি বিশ্বাস কর, বাবা,—এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি,—প্রথমটা আমার একটু কষ্ট হ'য়েছিল সত্যি, কিন্তু যেদিন হ'তে আমি শ্বাশুড়ীর আশ্রয় পেলাম সেদিন হ'তে আমি আমার সব দুঃখ ভুলে গেলাম। শ্বাশুড়ীর মনটা যে কত উদার, প্রাণে যে কী দরদ, তা' ব'লে বুঝান যায় না। শ্বাশুড়ীর কাছে আমি খুব আনন্দে আর শান্তিতে আছি, বাবা! এ-নিয়ে তুমি আর ভেবো না, একটু ঘুমোও।"

"সত্যি বল্‌ছিস, মা,—তোর মনে কোনো ক্ষোভ, কোনো দুঃখ নেই?"

"হ্যাঁ, বাবা, আমি তোমার কাছে কিচ্ছু গোপন ক'রছি না, আমি প্রাণ খুলে ব'ল্‌ছি,—আমি বেশ শান্তিতে ও আনন্দে আছি।"

"যাক্‌, রক্ষা ক'রলি মা,—এইবার আমার বুক হ'তে একটা বোঝা নেমে গেল, আমি তোদের রেখে এখন শান্তিতে যেতে পারবো,—উঃ! বুকটার মধ্যে বড় জ্বালা ক'রে উঠলো রে!—চেপে ধর্‌ মা, চেপে ধর্‌!"—

অরুণা ব্যস্ত হইয়া পিতার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল, এমন সময় সৌরীন ডাক্তার সঙ্গে করিয়া তথায় আসিয়া পৌছিল। সৌদামিনী ডাক্তারকে বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, আজ ওঁর রোগের যেন একটু বাড়াবাড়ি দেখছি। অপনি টাউনে সিভিল-সার্জ্জনকে একবার শিগ্‌গির 'কল' দিন!"

ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং প্রেসক্রীপসন চেঞ্জ করিয়া অন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। রোগী দেখিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় ডাক্তার গোপনে ম্যানেজারকে বলিয়া গেলেন,—"আজ ঘোর অমাবস্যা,—খুব সাবধান, রোগীকে বেশী নড়া-চড়া ক'রতে দেবেন না।—আজকের রাত্রিটা না-কাটলে কিছু বলা যায় না!"

জমিদারীর কাজ-কর্ম দেখা-শুনা করিবার জন্য রেবতীমোহন সেই-যে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন, সেখান হইতেই অসুস্থ হইয়া বাটী ফিরিয়াছেন, রোগ

ক্রমশঃ বাড়িয়া নিউমোনিয়ায় পরিণত হওয়ায় রেবতীমোহনকে শয্যা গ্রহণ করিতে হইল, কিন্তু সেই শয্যাই হইল তাঁহার শেষ-শয্যা,—অমাবস্যার রাত্রি আর কাটিল না, নিজ পরিজনকে গভীর শোকে ডুবাইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে রেবতীমোহন ইহ সংসার হইতে চিরবিদায় লইলেন।

রেবতীমোহন পূর্বাহ্নেই নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কাজেই পাড়ার পাঁচজনকে ডাকাইয়া তাঁহার জমিদারী-সম্পত্তির একটা উইলপত্র সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। উইলে সম্পত্তির অর্ধেকাংশই তিনি অরুণার নামে দিয়া গিয়াছেন এবং ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ হইতে দশ লক্ষ টাকাও অরুণাকে দিবার নির্দেশ আছে।

সেদিন সিঙ্গাপুরে, ব্রজেন্দ্রের আড্ডায় রাত্রিকালে যে নাটকীয়-ব্যাপার ঘটিয়া গেল, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে ঘটনাস্থলে পুলিস আসিয়া সেই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে।

গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী, আমাদের সেই নিমাইবাবু সব্যসাচীর সন্ধানে সিঙ্গাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনিও এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্রজেন্দ্রের পকেটে একটা নোটবুক পাওয়া গিয়াছে, নোটবুকের এক পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—**"এই পৃথিবীর বুকে, ব্রজেন্দ্র এবং সব্যসাচীর এক সঙ্গে আর বাঁচিয়া থাকা চলিতে পারে না,—বাঁচিয়া থাকিবে একজন,—হয় সব্যসাচী, নয়, ব্রজেন্দ্র।"**...ইহা হইতে নিমাইবাবু বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সব্যসাচী স্বয়ং এই হত্যাকাণ্ডের মূলে আছেন।

অনুসন্ধানের কাজ শেষ হইলে, শবগুলিকে পরীক্ষার নিমিত্ত মর্গে প্রেরণ করা হইল। নানাপ্রকার আসবাব-পত্রসহ পুলিস ৪টী পিস্তলও ব্রজেন্দ্রের আড্ডা হইতে লইয়া গেল। পিস্তলগুলি পরীক্ষা করিয়া নিমাইবাবু বুঝিতে পারিলেন, উহা সাধারণ পিস্তল অপেক্ষা কতকটা অন্য ধরণের। তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—রেঙ্গুনেও একটি আড্ডায় খানাতল্লাসীর সময়, পুলিস অনুরূপ কয়েকটি পিস্তল হস্তগত করিয়াছিল। সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন, রেঙ্গুনের সেই আড্ডার সহিত এই আড্ডার নিশ্চয়ই সম্পর্ক আছে।

ব্রজেন্দ্রের আড্ডা হইতে বাহির হইয়া সহরের দিকে আসিতে যে চীনা পল্লী আছে, পুলিস সেই পল্লীর ক'একটি বাড়ীতে খানাতল্লাসী আরম্ভ

করিয়াছে, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ক'এক ব্যক্তিকে অনেক জেরা করায় তাহার মধ্যে একজন বলিয়াছে—"গতকল্য সন্ধ্যার অল্পকাল পরে সে একটি লোককে হুঁকা হাতে করিয়া এই রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়াছে। লোকটি চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তাহারা কয়েকটি আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সেই সময় তাহারা তাস খেলায় মত্ত থাকায় ও-বিষয়ে তেমন খেয়াল করে নাই। যাহা হউক, পুলিস সন্দেহবশে ক'একজন নির্দোষ-ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়া হাজতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত নিমাইবাবু বহু অনুসন্ধান করিতেছেন। রেঙ্গুনের অফিসে পত্রাদি লিখিয়া সেখান হইতেও অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি আসল-ব্যাপারের কোন সন্ধানই পান নাই। দুই দিন পূর্বে ব্রজেন্দ্রের আড্ডা-গৃহের সংলগ্ন সেই ডোবাতে একটি বিকৃত-শব পাওয়া গিয়াছে; শবটি এরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া নিমাইবাবু মৃত-ব্যক্তির প্রকৃত চেহারা সম্বন্ধে কিছুই ধারণা করিতে পারিলেন না। তিনি একবার ভাবিলেন তাহা হইলে, সব্যসাচীর ইহ-লীলার কি এইখানেই অবসান হইল? কিন্তু তিনি অন্তরের সহিত তাঁহার মনের এই যুক্তি সমর্থন করিতে পারিলেন না। তথাপি নিমাইবাবু তাঁহার এই সন্দেহের কথা পুলিস-কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া রাখিলেন।

* * *

সহরের উত্তরাংশে কুলি-মজুরদের একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। পল্লীর শেষ প্রান্তে একজন ডোমজাতীয় লোক বাস করে, লোকটি এই অঞ্চলে "শাদান" নামে পরিচিত। শাদানকে কখনও কখনও তাহার গৃহ হইতে

কিছুদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিতে দেখা যায়। সে বিবাহ আদি করে নাই, তাহার দেহ বেশ বলিষ্ঠ, মুখে দাড়ি-গোফ আছে। চার-পাঁচটি শুকর মাত্র তাহার সম্বল। তাহার গৃহে দুইখানি ভগ্ন-কুটির ব্যতীত অপর কোন ঘর নাই; কুটিরের সংলগ্ন একটি চালা আছে, ঝড়-বৃষ্টির সময় শূকরগুলি তাহাতেই আশ্রয় লয়। মাঝে-মধ্যে শাদানের দুই একজন জ্ঞাতি-ভ্রাতা আসিয়া তাহার গৃহে অবস্থান করে।

একদিন অতি প্রত্যূষে একজন নিম্নতন পুলিস কর্মচারীসহ ছদ্মবেশে অনুসন্ধানকার্যে বহির্গত হইয়া নিমাইবাবু পুলিসকর্মচারিটির নির্দ্দেশক্রমে উক্ত পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই পুলিসকর্মচারিটির নাম তীর্থঙ্কর। তীর্থঙ্করকে অনুসরণ করিয়া নিমাইবাবু ক্রমশঃ উক্ত শাদানের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তীর্থঙ্করকে শাদানের কুটিরের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নিমাইবাবু বলিয়া উঠিলেন—"এ আবার কোথায় নিয়ে চ'ল্লে?" তীর্থঙ্কর নিমাইবাবুকে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল এবং কুটিরের নিকটবর্তী হইয়া নিমাইবাবুকে উঠানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া শাদানের কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কুটিরের অভ্যন্তরে শাদান একটি কাটারি দিয়া একগাছি বাঁশের লাঠি পরিষ্কার করিতেছিল। তীর্থঙ্করকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শাদান প্রশ্ন করিল—"alone or with?"

তীর্থঙ্কর উত্তর করিল—"with.—Where is he?"

শাদান অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তাহার অপর কুটিরটি দেখাইয়া দিল।

তীর্থঙ্কর ঘরের বাহিরে আসিয়া তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্য নিমাইবাবুকে ইঙ্গিত করিল। অপর কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সে দরজায় তিনটি টোকা মারিয়া একপ্রকার সঙ্কেত-ধ্বনি করিতেই, ভিতর হইতে

একব্যক্তি দরজা খুলিয়া দিল। তীর্থঙ্কর নিমাইবাবুকে তাহার সহিত কুটিরের ভিতর প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া নিমাই-বাবু দেখিতে পাইলেন, দরজার পাশে একব্যক্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং মেঝের উপরে একটি ছেঁড়া চাটাইয়ে অপর এক ব্যক্তি হেঁট-মুখে ধীরভাবে উপবিষ্ট আছে। তাহার মাথায় একটি ময়লা পাগড়ী, গায়ে একটি কাল রংয়ের ফতুয়া এবং মুখে গোঁফ। নিমাইবাবুকে সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, উপবিষ্ট-ব্যক্তিটি ঘাড় তুলিয়া স্থির-দৃষ্টিতে নিমাইবাবুর মুখের প্রতি চাহিল। নিমাইবাবু ইহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, কারণ ইহার চোখ দুটি তাঁহার খুব পরিচিত বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তিনি সেই চোখের দৃষ্টির এক আশ্চর্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন—এ-দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং অন্তর্ভেদী! উপবিষ্ট-ব্যক্তিটি তীর্থঙ্করকে বলিল—"বিজন, ও-ঘর হ'তে একটা চাটাই নিয়ে এসে নিমাইবাবুকে ব'সতে দাও।"

উক্ত ব্যক্তিটি নিমাইবাবুর নাম উচ্চারণ করায় এবং তীর্থঙ্করকে 'বিজন' বলিয়া সম্বোধন করায়, নিমাইবাবু আরও অবাক হইলেন! তীর্থঙ্কর চাটাই লইয়া আসিলে নিমাইবাবুকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, উপবিষ্ট-ব্যক্তিটি বলিল—

"অজানা এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আশ্চর্য হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, নিমাইবাবু,—আপনি বসুন।" এই বলিয়া সে মাথার পাগড়ী এবং কৃত্রিম গোঁফ খুলিয়া ফেলিয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া নিমাইবাবুকে বলিল—"আপনার পকেটে যে ফটো আছে, এইবার তার সাথে মিলিয়ে দেখে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন!

"এ-কি, এ-যে সব্যসাচী।" এই অভাবনীয় ব্যাপারে নিমাইবাবু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন!

সেইদিন রাত্রে পৃথিবীর বক্ষ হইতে ব্রজেন্দ্রের অস্তিত্ব চিরতরে মুছিয়া ফেলিয়া, সব্যসাচী হীরাসিং-সহ শাদানের এই কুটিরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। এই শাদান এবং তীর্থঙ্করের পরিচয় পাঠকবর্গ পরে জানিতে পারিবেন।

রাত্রিকালে শাদানের কুটিরে সেইদিন সব্যসাচীর আর নিদ্রা হইল না, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মেঝের একখানি চাটাইয়ের উপর বসিয়া রহিলেন। আর হীরাসিং আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের ন্যায় সজাগ হইয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

সব্যসাচী আজ কি-এক গভীর ভাবে মগ্ন—তাঁহার এ-অবস্থা জাগ্রতও নয় নিদ্রিতও নয়—ইহা এক প্রকার ধ্যানস্থ অবস্থা। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিল; চতুর্দিকে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে; সব্যসাচীর চেতনা দেহাতীত হইয়া এক জ্যোতির্ময়-ক্ষেত্রে নিবদ্ধ। এই অপরূপ উদ্ভাসিত আলোকে, এক অপরূপ দেবী-মূর্তি সব্যসাচীর সম্মুখে প্রকট হইয়া, শান্ত মধুর স্বরে যেন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"ক্ষান্ত হও, সব্যসাচী! প্রাণাবেগ সংযত কর; আমার দিব্য-কর্মের জন্য প্রস্তুত হও!"

সব্যসাচী আবেগভরে প্রশ্ন করিল—কে তুমি মা, মহিমময়ী! আমার অন্তরের জ্বালা, ভারতের এই পরাধীনতার জ্বালা, তুমি কি বোঝ না মা?"

উত্তর আসিল—"কিন্তু, এ-পথে নয় সব্যসাচী! আমার চিন্ময়ী-শক্তির প্রতি নিজেকে খুলে ধর, প্রকৃত-পথ এবং নির্দেশ যথাসময়ে পাবে; জগতের মঙ্গলের বাণী এই ভারতেই একদিন ঝংকৃত হ'য়ে উঠবে, আর তোমাকেই হ'তে হবে সেই বাণী বহনের যন্ত্র।"

এই বলিয়া জ্যোতির্ময়ী মূর্তিটি ধীরে ধীরে সব্যসাচীর দৃষ্টির অন্তরাল হইল।

সব্যসাচী ক্রমে তাঁহার বাহ্য চেতনায় ফিরিয়া আসিলেন। হীরাসিং তাহার প্রভুর এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া অবাক হইল! সব্যসাচী বাহ্য-জ্ঞানহীন অবস্থায় আবেগভরে কাহার সহিত যে উক্তরূপ বাক্যালাপ করিলেন, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

আজ সব্যসাচীর মনে পড়িয়া গেল—একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভারতী তাহাকে বলিয়াছিল—"হিংসার পথে যারাই প্রবৃত্তি দেয়, তারাই এম্নি ক'রে বলে। এই শেষ কথা নয়, জগতে এর চেয়েও বড়, ঢের বড় কথা আছে।"

তাহার উত্তরে সব্যসাচী বলিয়াছিলেন—"কি আছে বল শুনি।"

ভারতী তখন উচ্ছ্বাসভরে বলিয়াছিল—"সে তাহা জানে না, তাহা সব্যসাচীই জানেন। যে বিদ্বেষ সব্যসাচীর সত্যবুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একবার তাহাকে ত্যাগ করিয়া, যদি তিনি শান্তির পথে ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার জ্ঞান তাঁহার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মানিবে না, এমন সমস্যা পৃথিবীতে নাই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার, এ তো বর্বরতার দিন থেকেই চ'লে আসছে। এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায় না?"

উহার উত্তরে সব্যসাচী বলিয়াছিলেন—"কে বলিবে?"

ভারতী তখন অকুণ্ঠিতস্বরে উত্তর করিয়াছিল—

"সব্যসাচীই তাহা বলিতে পারেন।"

বিদ্রোহী সব্যসাচীর বিচার বুদ্ধি ভারতীর এই যুক্তি তখন উপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু আজ কোন্ মঙ্গলময়ী শক্তির ইচ্ছায় সব্যসাচীর অন্তর খুলিয়া গেল—তিনি আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন—জগতে ইহার চেয়েও ঢের বড় কথা আছে। সেই বাণী এই ভারতেই ঝংকৃত হইয়া উঠিবে।

১১

নিমাইবাবুর এক ভাগিনেয়, নাম অচলকুমার মিত্র, যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল, সেই সময় একদিন হঠাৎ কোথায় সে নিরুদ্দেশ হইল! তার পর বহুদিবস কাটিয়া গেল, অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহার কোন সন্ধান আর পাইল না।

অচলকুমার বাল্যকালে খুবই চঞ্চল এবং বড় একজিদে ছেলে ছিল। সে যাহা করিবে বলিত, তাহা না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইত না। গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করিয়া অচল কলিকাতায় তাহার এক মাতুলের নিকট থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিল। পরের বৎসরেই তাহার বি-এস্-সি পরীক্ষা দিবার কথা। অচলের এক সহপাঠি ছিল, নাম বিজন অধিকারী। তাহার সহিত অচলের বেশ বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছিল। দুই জনের মধ্যে অনেক বিষয়ে আলোচনা হইত। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন তাহাদের আলোচনার মুখ্য বিষয়-বস্তু ছিল।

একদিন কোন একটি পার্কে বেড়াইতে গিয়া, একটি গাছের নীচে বসিয়া অচল ও বিজনের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল:

বিজন বলিল, "স্বাধীনতা অর্জনের মোটামুটি তিনটি পথ আপাতত আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—প্রথম হ'চ্ছে, ইংরাজবাহাদুর, তাঁদের বিবেচনায় ভারতবাসীকে যখন উপযুক্ত মনে করবেন, তখন তাঁরা দয়াপরবশ হ'য়ে আমাদেরকে যে হোমরুল প্রদান ক'রবেন, সেই আশায় ব'সে থাকা। দ্বিতীয়—মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত এই 'অসহযোগ আন্দোলন'

আর তৃতীয় হ'চ্ছে—লেনিন প্রবর্তিত 'বোলশেভিজ্‌ম্‌'—সহজ কথায় যাকে বলে, কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহ। এই তিনটি পথের মধ্যে কোনটি সব চেয়ে বেশী কার্যকরী ব'লে তোমার মনে হয়, অচল?"

বিজনের ঐরূপ প্রশ্নে অচল উত্তর করিল "লেনিনের পন্থাই আমি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ ব'লে মনে করি।"

অচলের উত্তরে বিজন একটু উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল—"ঠিক ব'লেছ অচল! চাই বিদ্রোহ—বিদ্রোহ ছাড়া কোন বিষয়ের আমূল পরিবর্তন আসা কখনই সম্ভব নয়। রুশ সম্রাট জারের অত্যাচার, কৃষক এবং শ্রমিকদের প্রতি অমানুষিক অবিচার, লেনিন একদিন মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রেছিলেন। ধনতন্ত্র আর রাজতন্ত্রকে সমূলে ধ্বংস ক'রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সম্রাট জারের অত্যাচার হ'তে জাতিকে বাঁচাবার জন্য তিনি যে-বিদ্রোহের সৃষ্টি ক'রেছিলেন, তাতে লেনিনকে তাঁর জীবনে বহু নির্যাতন ভোগ ক'রতে হ'য়েছে। কিন্তু এতো অত্যাচারেও তিনি উদ্যম-হীন হ'য়ে পড়েননি—আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা অবশেষে লেনিন তাঁর উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত ক'রতে পেরেছিলেন; গোপন ষড়যন্ত্রের দ্বারা কৃষক এবং শ্রমিকদের জাগিয়ে তুলে সংঘবদ্ধভাবে রাজশক্তির বিরুদ্ধে লেনিন একদিন অস্ত্রধারণ ক'রতে পেরেছিলেন ব'লেই তিনি তাঁর জীবনে চরম সাফল্য লাভ ক'রেছিলেন। আজ আমাদের দেশের অবস্থাও সেইরূপ। দেশের এবং জাতির মেরুদণ্ড কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় ধনিকসম্প্রদায়ের শোষণের ফলে আজ অর্ধ-মৃত অবস্থায় এসে পৌচেছে। এই শোষণ এবং নিষ্পেষণের কবল হ'তে জাতিকে মুক্ত ক'রতে হবে। এর জন্য চাই বিদ্রোহ।"

এই বলিয়া অচলকে সম্বোধন করিয়া বিজন পুনরায় প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা অচল! আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রতে পারি?"

অচল বিজনের উক্তরূপ প্রশ্নের অর্থ বুঝিল না, সে উত্তর করিল· "হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন? তোমার সাথে আমার ব্যবহারে বা আদান-প্রদানে তুমি কি কখনও আমার দিক হ'তে কোন অবিশ্বাসের কারণ পেয়েছ?"

বিজন বলিল—"না, অচল! আমি সে-কথা ব'লছি না। দেশকে সাম্রাজ্যবাদের এবং ধনতান্ত্রিকতার কবল হ'তে মুক্ত ক'রতে যদি আমাদেরকে শেষ পন্থা অবলম্বন ক'রতে হয়, তবে জীবনের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দিয়ে, সেই পথের নীতি ও মর্যাদা রক্ষা ক'রে চ'ল্‌তে তুমি প্রস্তুত আছ কি না?"

অচল অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"তোমার এ-প্রশ্নের উত্তর কথার দ্বারা দেওয়া চলে না; জীবনে সত্যকারের পরীক্ষা যখন আসে, তখন একমাত্র কাজের দ্বারাই এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। তবে তুমি এ-বিষয়ে আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।"

অচলের উত্তরে বিজন খুসী হইয়া বলিল—"তোমার দৃঢ়তার উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে, অচল! তবুও এ-বিষয়ে তোমার মতামত জানা আমার দরকার ছিল।"

অতঃপর বিজন অচলকে বলিল—"এস আজ আমি তোমাকে আমাদের এক গুপ্ত সমিতিতে নিয়ে যাবো।" এই বলিয়া উভয়ে গাত্রোত্থান করিল।

বিজন অচলকে সঙ্গে লইয়া সহরের একপ্রান্তে একটি বাগান-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এই বাগান-বাড়ীর এক নিভৃত কক্ষে সমিতির তিন-চারি জন সভ্য কি-একটি বিষয়ের আলোচনায় রত ছিল, বিজন উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিয়া অচলকে সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে যাইয়া বলিল—অচল তাহার একজন অন্তরঙ্গ-বন্ধু, সে তাহাদের সমিতিতে একজন বিশ্বস্ত এবং নির্ভীক-কর্মীরূপে ব্রতী হইতে রাজি আছে। সমিতির

উপস্থিত সভ্যরা সকলেই তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া অচলকে বসিবার নিমিত্ত আসন প্রদান করিল।

অচল জানিতে পারিল, সারা ভারতে এবং ভারতের বাহিরে প্রায় সকল বড় বড় সহরেই তাহাদের এই সমিতির বহু শাখা আছে। এবং ইহার মূলে রহিয়াছে এক মহামানবের সৃজনী-শক্তি।

অচল বিজনের সহিত প্রায়ই গোপনে উক্ত বাগান-বাড়ীতে যাইয়া সমিতির অপরাপর সভ্যদের সহিত নানা-বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইত। বিজনের নিকট তাহাদের এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য এবং রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়াছে। সুতরাং সেই মহামানবের সাক্ষাৎলাভের জন্য তাহার প্রাণে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। বিজন নিজেও অদ্যাবধি এই আশ্চর্য-ব্যক্তিটিকে দর্শন করে নাই, সেও অপরের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় শুনিয়াছে মাত্র। সুতরাং তাহারও প্রাণে বহুদিন হইতে আকাঙ্ক্ষা আছে, একবার সেই মহামানবকে দেখিতেই হইবে। তাহাদের সমিতির প্রেসিডেণ্ট রুদ্রতেজের নিকট বিজন তাহাদের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট বলিলেন—তাহাদের গুরু বর্তমানে রেঙ্গুনে কিম্বা তাহার পার্শ্ববর্তী কোন সহরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বহু নাম ধারণ করেন—সমিতির সভ্যদের নিকট তিনি "সব্যসাচী" এবং "ডাক্তার" নামে পরিচিত। রুদ্রতেজ বিজনকে আরও বলিলেন—"তাঁর সহিত সাক্ষাৎলাভ আমার জীবনের সবচেয়ে বড়-সৌভাগ্য। সিঙ্গাপুরে ঘটনাচক্রে তাঁর সঙ্গে প্রথম আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁরই আদেশে আমি এখানে এই সংঘ গ'ড়ে তুলছি। নানা বিষয়ে আমার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হ'য়ে তিনি আমাকে এই কাজের ভার দিয়েছেন।···কিন্তু রেঙ্গুনে গিয়ে তোমরা যে তাঁকে খুঁজে বের ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে পারবে, তা তো আমার মনে হয় না। তবে একটা

ব্যবস্থা আমি ক'রতে পারি—রেঙ্গুনে হীরাসিং নামে আমাদের সংঘের এক-জন কর্মী আছে, সে পোষ্ট-অফিসে টেলিগ্রাফ-পিয়নের কাজ করে। আমি তার নামে তোমাদেরকে একটা পরিচয়-পত্র দিচ্ছি ; রেঙ্গুনে পৌছে আমার চিঠি নিয়ে হীরাসিংএর সঙ্গে দেখা ক'রলে, সে তোমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারবে।"

অচলকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতে যেদিন বিজন রেঙ্গুনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পরদিন হীরাসিংএর সহিত সাক্ষাৎ হইতেই বিজন এবং হীরাসিং উভয়েই আশ্চর্য হইল! হীরাসিং বিজনকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দেখিয়া গুরমুখী-ভাষায় বলিয়া উঠিল—

"কি-আশ্চর্য! তীর্থঙ্কর, তুমি এখানে কোথা হ'তে এলে?"

বিজনও হীরাসিংকে চিনিতে পারিয়া বিশুদ্ধ গুরমুখী ভাষায় উত্তর করিল—"আরে, মিঃ সবর‍্ওয়াল! আপনিই হীরাসিং?"

* * *

বিজন যখন ছেলেবেলায় পাঞ্জাব প্রদেশের জলন্ধরে তাহার এক খুল্লতাতের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিত, সেইসময় এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সহিত তাহার বেশ আলাপ হয়। এই ভদ্রলোকটির নাম মিঃ সবর‍্ওয়াল। বিজন পাঞ্জাবে অবস্থানকালে গুরমুখী ভাষায় বেশ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল এবং উক্ত সবর‍্ওয়াল বিজনের নাম রাখিয়াছিল তীর্থঙ্কর। বিজন তাহাদের নিকট এই তীর্থঙ্কর নামেই পরিচিত ছিল। সবর‍্ওয়াল তীর্থঙ্করকে নিজের ছোট ভাইয়ের ন্যায় যথেষ্ট স্নেহ করিত। বিজনও সবর‍্ওয়ালকে বড়-দাদার ম'তই সম্মান করিয়া চলিত। ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধের সময় মিঃ সবর‍্ওয়াল সৈনিকদলে ভর্তি হইয়া যুদ্ধে গিয়াছিল, বিজন তাহার নিকট যুদ্ধক্ষেত্রের বহু রোমাঞ্চকর এবং বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিত এবং ভবিষ্যতে সে নিজেও একজন সৈনিক হইবে, এরূপ ইচ্ছা সবর‍্ওয়ালের নিকট প্রকাশ করিত।

বিজনের খুল্লতাত জলন্ধরে গভর্ণমেন্টের কোন এক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহাকে কলিকাতায় বদলি হইতে হইল। সুতরাং বিজনের আর পাঞ্জাবে থাকা হইল না।

পাঞ্জাব ত্যাগের পর দীর্ঘকাল পরে রেঙ্গুনে সবর্ওয়ালের সহিত বিজনের সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিল। বিজন ও অচল আপাতত রেঙ্গুনে হীরাসিংএর বাসায় অবস্থান করিতে লাগিল।

হীরাসিং পোষ্ট অফিসের কাজ নামে মাত্র করিতেছে। ডিউটি হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যহ সে তাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়।

বিজন আসার পরদিন সন্ধ্যার সময় হীরাসিং বিজনকে বলিল—"তোমরা বাসায় থাক, আমার ফিরতে একটু রাত্রি হবে।"

বিজন বলিল—"কেন, আমাদেরকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন না?"—হীরাসিং তাহাতে অসম্মতি জানাইল।

রুদ্রতেজের পরিচয়-পত্রের কথা বিজনের স্মরণই ছিল না। কারণ হীরাসিংএর সহিত পূর্ব হইতেই সে এতো বেশী পরিচিত যে নূতন করিয়া আর পরিচয় করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু হীরাসিং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অসম্মত হওয়ায়, রুদ্রতেজের পত্রের কথা বিজনের মনে পড়িয়া গেল। বিজন সেই পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া হীরাসিং-এর হস্তে প্রদান করিল। হীরাসিং পত্রখানি পাঠ করিয়া একটু অবাক হইল বটে, কিন্তু তাহার মনে বেশ আনন্দও হইল। কারণ সে যাহা সন্দেহ করিয়াছিল তাহা নহে। বিজন এবং অচল যে তাহাদেরই পথের পথিক, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। বিজন প্রশ্ন করিল—"কি দাদা! এবার তো আপনার আর কোন আপত্তি নেই?"

হীরাসিং উত্তর করিল—"মোটেই না। তোমরা যে-লোকের পরিচয়-

পত্র নিয়ে এসেছ, তিনি সিঙ্গাপুরে আমাদের মাষ্টারের অতি প্রিয়-পাত্র ছিলেন। মাষ্টার তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতে পেরেছিলেন ব'লেই ক'লকাতায় আমাদের একটা ঘাঁটি স্থাপন ক'রবার এবং সেখানে কতকগুলি উপযুক্ত কর্মী গ'ড়ে তুলবার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ ক'রেছেন।" এই বলিয়া হীরাসিং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদের সঙ্গে পিস্তল আছে কি না। বিজন বলিল, তাহারা রুদ্রতেজের পরামর্শে উহা প্রায় সর্বদার জন্য তাহাদের কাছেই রাখে।

অতঃপর হীরাসিংএর নির্দেশে বিজন ও অচল তাহাদের বেশ পরিবর্তন করিয়া, হীরাসিংএর সহিত গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিল।

অচল ও বিজন হীরাসিংএর সহায়তায় রেঙ্গুনে সব্যসাচীর সহিত পরিচিত হওয়ার পর তাহারা আর কলিকাতায় ফিরে নাই। রেঙ্গুন কিম্বা সিঙ্গাপুরের কর্মস্থলে থাকিয়া, অতি বিশ্বস্ততার সহিত সব্যসাচীর আদেশ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সব্যসাচী তাহাদিগকে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে থাকিবার সম্মতি দিলেন, কারণ সিঙ্গাপুরে সব্যসাচীর যে-তুইজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিল, প্রায় ছয়মাস অতীত হইল, সব্যসাচী তাহাদিগকে হারাইয়াছেন। একদিন একটী জাহাজের যাত্রী জনৈক অত্যাচারী পুলিস-অফিসারের ইহলীলা মোচনের ভার সব্যসাচী তাঁহার নির্ভরশীল কর্মীদ্বয়ের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। সব্যসাচীর আদেশে তাহারা সেদিন জাহাজে তাহাদের কাজ হাসিল করার পর যখন তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল এইবার তাহা-দিগকে ধরা পড়িতে হইবে, তখন তাহারা অক্ষরে অক্ষরে তাহাদের সংঘের নিয়ম পালন করিয়াছিল—আর কাল বিলম্ব না-করিয়া উভয়ে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল। যদিও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপর্যুপরি কয়েক-বার গুলি ছোঁড়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কোন পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

উক্ত দুইজন কর্মীর অভাব পূরণের জন্য সব্যসাচী বিজন ও অচলকে সিঙ্গাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। হীরাসিং-এর চেষ্টায় বিজন "তীর্থঙ্কর" নামে পুলিসকর্মচারীর পদে ব্রতী হইল। আর অচল একজন নীচ-জাতীয় ডোমের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, "শাদান" নামে সহরের এক প্রান্তে একটী কুটিরে অবস্থান করিতে লাগিল।

এই "শাদান"ই নিমাইবাবুর সেই নিরুদ্দিষ্ট ভাগিনেয় অচলকুমার মিত্র, এবং "তীর্থঙ্কর" হইতেছে অচলের বন্ধু বিজন।

যেদিন সব্যসাচী শাদানের কুটিরে আসিয়া আশ্রয় লইলেন, তাহার কয়েকদিন পরে একদিন গভীররাত্রে বিজন আসিয়া সব্যসাচীকে নিমাই-বাবুর সিঙ্গাপুর আগমন সংবাদ দিয়া গেল। সব্যসাচী শাদানকে ডাকিয়া বলিলেন—"অচল! আজ আমাদের কর্মের রূপ পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হ'য়েছে।" হীরাসিং এবং বিজনও সেইস্থানে উপস্থিত ছিল। সব্যসাচী বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"আমি আরও সহজভাবে তোমাদের বুঝিয়ে ব'লছি—জাতির এবং দেশের মুক্তির জন্য আমরা যে-পথ অবলম্বন ক'রেছিলাম, আমাদের সেই পথের আজ পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হ'য়েছে—এ আমার প্রতি মহাশক্তির প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ। এতে তোমাদের কোন আপত্তি থাকলে, নিঃসংকোচে তোমরা তা' আমার নিকট প্রকাশ কর।" এই বলিয়া সব্যসাচী স্থিরদৃষ্টে তাহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সব্যসাচীর উক্তরূপ প্রশ্নে সকলে একবাক্যে জানাইল—তাহারা তাহাদের জীবন সব্যসাচীর আদেশ পালনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না—সব্যসাচী তাহাদিগকে যখন যে পথে যেমনভাবে চালিত করিবেন, সেইভাবে চলিতে তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তের জন্য প্রস্তুত।

সব্যসাচীর নির্দেশে, তীর্থঙ্কর নিমাইবাবুকে শাদানের কুটিরে সব্যসাচীর সম্মুখে হাজির করার পর, সব্যসাচী নিমাইবাবুর নিকট যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন নিমাইবাবুর আরও কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। কারণ, তীর্থঙ্করকে তিনি এতো দিন একজন বিশ্বস্ত পুলিসকর্মচারী বলিয়াই জানিতেন; সব্যসাচীর সহিত তীর্থঙ্করের যোগাযোগ আছে দেখিয়া, তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন। তীর্থঙ্করের সম্বন্ধে সব্যসাচীকে নিমাইবাবু কি প্রশ্ন করিতে যাইবেন, এমন সময় সব্যসাচীর ইঙ্গিতে শাদান নিমাইবাবুর পাদস্পর্শ করিয়া বলিল—"মামা! আজ বহুদিন পরে আপনার পায়ের ধুলো নেবার আমার সৌভাগ্য হ'ল। চিন্‌তে পারছেন-না বোধ হয়?—আমি আপনাদের অচল।"

এইবার নিমাইবাবু বুঝিতে পারিলেন এবং আবেগভরে অচলকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। অচল বলিল—"আর এই তীর্থঙ্কর হ'চ্ছে—আপনার বিশেষ-পরিচিত, ক'ল্‌কাতার সেই অম্বিকাবাবুর ভাইপো—বিজন।"

অচলের কথায় নিমাইবাবু বলিয়া উঠিলেন—"অম্বিকাবাবুর ভাইপো সেই বিজন?" তা' হ'লে নৌকাডুবিতে তার মারা যাওয়ার কথা মিথ্যা?"

"হ্যাঁ, আমরা যখন ক'ল্‌কাতা ছেড়ে চ'লে আসি, তখন বিজনের সম্বন্ধে ঐরকম গুজবই রটান হ'য়েছিল।"

অনেকদিন পরে নিমাইবাবুর সহিত অচলের মিলন-দৃশ্য সব্যসাচী লক্ষ্য করিতেছিলেন। অচলের কথা শেষ হইতেই, তিনি একটু মৃদু হাসিয়া নিমাইবাবুকে বলিলেন—"বিজন আর অচলের ম'ত এরূপ কর্মকুশল এবং নির্ভরশীল ছেলেদের বুকে পেয়ে, বাংলাদেশ ধন্য হ'য়েছে, নিমাইবাবু!—জানি না, বিশ্বনিয়ন্তা তাঁর কোন্ মঙ্গল-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এইসব যুবকদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্থাপন ক'রেছেন।—তবে একটা বিষয় আজ আপনি জেনে রাখুন নিমাইবাবু!—যে-সব্যসাচীকে আজ আপনি সামনে

দেখ্‌ছেন, এ-সব্যসাচী আর সে-বিদ্রোহী-সব্যসাচী নয়—সব্যসাচীর কর্মের এবং চিন্তার প্রবাহ আজ হ'তে অন্য পথে চালিত হ'ল—সব্যসাচীর কর্মের নিজস্ব প্রচেষ্টার এইখানেই পরিসমাপ্তি ; সব্যসাচী এখন মহাশক্তির দিব্য-প্রকাশের একটী যন্ত্র মাত্র। আজ হ'তে বিদ্রোহী সব্যসাচী সম্বন্ধে আপনি এবং আপনাদের গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, নিমাইবাবু।

নিমাইবাবু সব্যসাচীর এইরূপ উক্তিতে আশ্চর্য হইলেন এবং তিনি সব্যসাচীকে বলিলেন, "আপনার ন্যায় মহামানবের প্রতি আমারও একটা কর্ত্তব্য আছে, সব্যসাচী! আপনিও আজ হ'তে, আপনার বিরুদ্ধে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের পরোয়ানা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন।"

নিমাইবাবুর কথায় সব্যসাচী একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন—"পরোয়ানার চিন্তা তো কোন দিনই আমাদের নেই, নিমাইবাবু! যেদিন আমরা আমাদের কর্ম-পন্থাকে জীবনের ব্রত ব'লে মেনে নিয়েছি, সেইদিন হ'তে আত্মীয়-স্বজনের মায়া এমন কি আমাদের নিজেদের দেহের মায়া পর্যন্ত আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে হ'য়েছে। তবে জেলে যাওয়া বা ফাঁসিকাঠে ঝোলাকে আমি খুব বাহাদুরী ব'লে মনে করি না। কারণ তাতে আমাদের কাজ খুব পিছিয়ে পড়ে। সেইজন্য আমাদেরকে পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে চ'ল্‌তে হয়। তবুও আজ আপনি আমার বিষয়ে যে মহানুভবতার পরিচয় দিলেন তা' আমাদের চিরদিন স্মরণ থাক্‌বে নিমাইবাবু!"

নিমাইবাবু বলিলেন—"এ আর মহানুভবতা কি হ'ল সব্যসাচী?—সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। দেশের এইসব বিপ্লবী-যুবকদের অন্তরে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা যে কত উজ্জ্বল এবং কত সত্য, তা' কি আমি বুঝি না সব্যসাচী, সবই বুঝি। কাজেই আমার নিজের দ্বারা যাতে এদের কোন অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়ে আমি সতর্কই

থাকি। কিন্তু বিপ্লবীরা যখন নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনে, তখন বাধ্য হ'য়ে আমাকে তাতে হস্তক্ষেপ ক'রতে হয়। আমার বিশ্বাস —বিপ্লবীদের মধ্যে অনুপযুক্ত লোকের স্থান হওয়াতেই তাদের কাজ বাধা-প্রাপ্ত হয়। কাজেই, আমার মনে হয়—ভারতের মুক্তির জন্য বিপ্লবীদের পথ বোধ হয় শেষ-পথ নয়। কিন্তু সে যাই-হোক, সব্যসাচী! আজ আমি আপনার এইরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে যত বেশী বিস্মিত হ'য়েছি, আমার মনে আনন্দও তার চেয়ে ঢের বেশী হ'য়েছে। মঙ্গলময় ঈশ্বর, আপনার ন্যায় মহাপ্রাণকে ফাঁসিকাঠে এগিয়ে না-দিয়ে, তাঁর মঙ্গল-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জগতের সম্মুখে আরও উজ্জ্বল ক'রে ধ'রলেন, তা' ভারতবাসীর আজ কম সৌভাগ্য নয়। তাই আজ আপনার কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে যাবার আগে আর একটা কথা আমি আপনাকে জানিয়ে রাখছি সব্যসাচী,—যে-নিমাইবাবুকে আপনি এতোদিন গোয়েন্দা-পুলিস হিসেবে জেনে এসেছেন, তাকে শীঘ্রই আপনার কর্মের অংশ গ্রহণের জন্য আপনার আশ্রয়-প্রার্থীরূপে দেখতে পাবেন। আশা করি আমার সে-প্রার্থনা তখন নিশ্চয়ই মঞ্জুর হবে।" এই বলিয়া নিমাইবাবু একটু হাসিয়া সব্যসাচীর প্রতি চাহিলেন।

সব্যসাচী উত্তর করিলেন—"জগন্মাতার কাজের জন্য যদি আপনার প্রয়োজন হয়, তবে নিশ্চয়ই আপনাকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।...হ্যাঁ, নিমাইবাবু, একটা বিষয়ে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি —যদি-সম্ভব হয়, রেঙ্গুনে গিয়ে রামদাস তলোয়ারকরকে জেলমুক্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রবেন।

নিমাইবাবু সব্যসাচীকে ভরসা দিয়া বলিলেন, সেবিষয়ে তাঁহার সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।

১৩

পেন্সন লইয়া কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে নিমাইবাবুর আর মাত্র একমাস সময় অবশিষ্ট আছে। নিমাইবাবু ভাবিয়াছিলেন, দরখাস্ত করিয়া তাঁহার কার্যকাল আরও কিছুদিন বাড়াইয়া লইবেন। কিন্তু, সেইদিন শাদানের কুটিরে সব্যসাচীর অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া, নিমাইবাবু তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ভগবানের কাজে অতিবাহিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন। সুতরাং যত শীঘ্র তিনি গোয়েন্দাগিরির কাজ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল।

সিঙ্গাপুরের সেই ডোবায় যে বিকৃত-শবটি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা যে বিদ্রোহী সব্যসাচীর শব, নিমাইবাবু তাহার সে-সন্দেহ পূর্বেই পুলিস কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আর এক রিপোর্টে পুলিস কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন:—"সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, সিঙ্গাপুরের ডোবায় প্রাপ্ত শবটি সব্যসাচী ব্যতীত অপর কাহারো নহে।"

সব্যসাচীর বিষয়ে পুলিস-কর্তৃপক্ষের নিকট নিমাইবাবু কিরূপ রিপোর্ট দাখিল করিবেন তাহা তিনি সব্যসাচীকে কিছুই বলেন নাই। বিজন এ-বিষয়ে জানিবার কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু নিমাইবাবু মাত্র একটু হাসিয়া নীরব ছিলেন।

সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুনে আসিয়া অপরাপর বহু কাজে ব্যস্ত থাকায়, নিমাইবাবু তাঁহার ইচ্ছা সত্ত্বেও অপূর্বর আর কোন খোঁজ লইতে পারেন নাই। বিশেষ করিয়া সব্যসাচীর অনুরোধে তলোয়ারকরকে জেলমুক্ত

করার বিষয়ে রেঙ্গুনে তাঁহাকে অধিক সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার দেশ হইতে এক জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি হঠাৎ কলিকাতা রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

জেল-হাঁসপাতাল হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়া তলোয়ারকর অপূর্বর অনুরোধে বোথা কোম্পানীর বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। বড় সাহেব পুনরায় তলোয়ারকরকে অফিসের কাজে বহাল করিয়া লইয়াছেন। ভারতীর অনুরোধে তলোয়ারকর অফিসে এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া তাহার স্ত্রী এবং কন্যাকে আনিবার জন্য তাহার শ্বশুরালয় গিয়াছে।

তলোয়ারকরের স্ত্রী তাহার স্বামীকে জীবন-সঙ্কট অবস্থায় জেল-হাসপাতালে ফেলিয়া, নিরুপায় অবস্থায় আসিয়া যেদিন তাহার পিত্রালয়ে আশ্রয় লইল, সেইদিন হইতে অর্দ্ধাহারে অনাহারে সে সর্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট তাহার স্বামীর জীবন ভিক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার কাতর প্রার্থনা সত্যই ভগবানের কানে পৌছিয়াছিল। আজ স্বামীমুখ দর্শনে তাহার দেহে নূতন ভাবে প্রাণসঞ্চার হইল।

১৪

অপূর্বদের অফিসের আজ ছুটি। ভারতীর গৃহে, দ্বিতলের সেই বড় কক্ষটিতে, অপূর্ব, রাজীব, ভারতী এবং 'পথের দাবী'র আরও কয়েক-জন সভ্য মিলিয়া কথা-বার্তায় রত আছে। তলোয়ারকর তাহার স্ত্রী-কন্যা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সেও আজ ভারতীর বাসায় আসিয়া সকলের সহিত আলোচনায় যোগ দিয়াছে।

রাজীবলোচনের সহিত আলাপে সকলেই বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছে। তলোয়ারকর রাজীবের প্রশংসায় বলিল যে, সে তাহার জীবনে বাঙালী জাতির মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে, তাহাদের প্রাণ এতো উদার এবং তাহারা এতো বেশী ভাব-প্রবণ ও সরল যে, অতি-সহজেই যে-কোন জাতিকে তাহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই একান্ত আপনার করিয়া লইতে পারে। রাজীবের প্রতি চাহিয়া তলোয়ারকর বলিল, রাজীবের সহিত মাত্র দুইদিন হইল তাহার পরিচয় হইয়াছে, এবং মধ্যে রাজীব তাহাকে নিজের বড় ভাইয়ের মতই আপনার করিয়া লইয়াছে।

তলোয়ারকরের কথা শেষ হইতেই, ভারতী রাজীবকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"রাজীববাবু! তা' হ'লে আমি দেখ্‌ছি—আপনি যাকে সাম্‌নে পাচ্ছেন, তাকেই আপনার ক'রে ফেল্‌ছেন। কিন্তু, একজনকে সবচেয়ে বেশী আপনার ক'রে নেবার জন্যে কাল্‌কে-যে আমি আপনাকে ব'ল্‌লাম সে-বিষয়ে কি স্থির ক'রলেন?—না, মাত্র একটু হেসে এ-বিষয়ে নীরব থাক্‌লে চ'লবে না, এর একটা স্পষ্ট জবাব আমি আপনার কাছে চাই।—এই দেখুন-না, আপনাদের অপূর্ববাবু তাঁর দেশকে, দেশের লোকজন

সকলকে খুব আপনার ব'লেই তো জানেন, তবুও তাঁকে এই সবার মধ্যে বেছে নিয়ে, এই একজনকে সবচেয়ে বেশী আপন জনের আসনে বসাতে হ'য়েছে তো?" এই বলিয়া অপূর্বর প্রতি চাহিয়া ভারতী একটু মুচ্‌কি হাসিল।

তাহাদের উদ্দেশ্য যদি কার্যে পরিণত হয়, তবে রাজীবের সহিত অপূর্বর অনুরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া ভারতীর উক্তরূপ রসিকতায় অপূর্ব একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"আচ্ছা, ভারতী, একবার কথা ব'লতে আরম্ভ ক'রলে তোমার কি আর মুখের বাধন থাকে না?"

অপূর্বর এইরূপ বিরক্তির কারণ ভারতী বুঝিল। তবুও সে বলিল—"মানুষের জীবনে যা' একেবারে সুস্পষ্ট এবং সত্য ঘটনা, বিশেষ ক'রে তোমার-আমার বিষয়ে একেবারে যা' নির্বিকার সত্য, তা' একটু রসালো ক'রে ব্যক্ত করতে গিয়ে যদি মুখের বাঁধনটা একটু আল্‌গা হ'য়ে গিয়েই থাকে, তাতে আমি দোষের তো কিছুই দেখ্‌ছি না।"

রাজীব দেখিল, তাহাকে উপলক্ষ করিয়া অপূর্ব-ভারতীর মধ্যে তর্ক ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং রাজীব ভারতীকে বলিল—"কেন আপনারা অনর্থক নিজেদের মধ্যে তর্কের সৃষ্টি ক'রছেন? আমি তো আপনাকে আমার জীবনের আগেকার ঘটনা সংক্ষেপে প্রায় সবই ব'লেছি; বিয়ে করার দিকে যে আমার মোটেই আগ্রহ নেই তাও আপনি জানেন। সুতরাং আমি আপনার কাছে করজোড়ে নিবেদন ক'রছি, এ-প্রসঙ্গ এইখানেই ইতি করুন।"

ভারতী রাজীবের এইরূপ সবিনয় উক্তিতে হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"কিন্তু রাজীববাবু, আমাদের প্রসঙ্গের 'ইতি' না-হয় আপনার কাতর নিবেদনে এইখানেই করা গেল। কিন্তু, আপনার জীবনের তো আর এইখানেই

'ইতি' ক'রবার অধিকার আমাদের কারো নেই? আপনার জীবনের বেশীরভাগ দিনগুলোই আপনার সাম্‌নে এখনও প'ড়ে আছে। সে-দিনগুলো তো আপনাকে কাটাতে হবে? সুতরাং আপনি-কি মনে করেন, আপনার অতীত-দিনের সেই নিরাশ-ছবিটিকে আপনার দৃষ্টির সামনে উজ্জ্বল রেখে আপনি বেশ স্বস্তির সঙ্গে আপনার জীবনের পথে এগিয়ে চ'লতে পারবেন? মানুষের জীবনের গতি আঁকা-বাঁকা পথে কত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। এই চলার পথে অনাবিল আনন্দ যা' সামনে এসে দেখা দেয়, তাকে সাদরে বরণ ক'রে নেওয়াই হ'চ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। তা' নইলে মানুষের জীবন চিরদিন একঘেয়েই থেকে যায়। মানুষের জীবনে ব্যর্থতা তো অহরহই আসে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু, তাতে যে ভেঙে পড়ে, সে ধীরে ধীরে মৃত্যুকেই বরণ ক'রে নেয়। এই ধরুন, বিধাতা যদি তাঁর করুণা-ভরা চোখ দুটো মেলে আমাদের দিকে না-চাইতেন, তা' হ'লে তো আপনাদের অপূর্ববাবুকে, বার-ব্রত করা কেষ্ট-বিষ্টু-জপা কোন নিষ্ঠাবতী পল্লীবালার আঁচলের মধ্যেই ফিরে যেতে হ'ত, আর আমাকেও তা' হ'লে হয় তো একটা হাঁড়ি-মুখো, চ্যাপ্‌টা-নেকো কাউকে আশ্রয় ক'রে মনের খেদ মেটাতে হ'ত।"

ভারতীর এই কথায়, সেদিন শেষ-রাত্রে ভারতী যে-স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা অপূবর মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল —"তা-ই হওয়া উচিৎ ছিল তোমার।"

অপূবর কথায় ভারতী উত্তর করিল—"শকুনের শাপে তো আর গরু মরে না?—তা' হ'লে সবার আগে বিধাতা-পুরুষকে অপূর্ব-ভারতীর বিধিলিপির আসল পুঁথিখানাকে পুড়িয়ে একেবারে ছাই ক'রে ফেলে

তাকে নকল একখানা বিধিলিপি তৈরি ক'রতে হ'ত! কিন্তু তা' তো আর তিনি পারেন না—জালিয়াতির দায়ে জেল খাটার ভয় বিধাতা-পুরুষেরও তো আছে?"

ভারতীর কথায় এইবার সকলেই হাসিয়া উঠিল। তলোয়ারকর বলিল—"হাঁ হাঁ, ভারতী দেবী-নে বহুত ঠিক বাত কহী হ্যায়। আরে, পরমাত্মা-নে জিসকে ভাগ-মে জো লিখ্ দিয়া হ্যায়, উসে মিটানে ওয়ালা দুনিয়ামে অওর কোই হ্যায়? লেকিন, আপলোগোকী বাত-চিৎসে মুঝে মালুম হোতা হ্যায় কি আপ্‌লোগ্ রাজীব ভাইকো শাদি করনেকে লিয়ে রাজি করওয়ানা চাহ্‌তে-হে, লেকিন্ ইস্‌মে রাজীব ভাইকী পুরী ইচ্ছা নেহি হ্যায়।"

তলোয়ারকর রাজীবকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—বিবাহ করিতে তাহার ভয় বা দ্বিধা বোধ করা মোটেই উচিৎ নহে। জীবনে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে, সংসারের সকল বিষয়েই মানুষকে সম্যক জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে। তাহাদের জীবন হইতেছে সৈনিকের জীবন—তাহারা সংসারেও থাকিবে এবং কর্ত্তব্যের আহ্বানে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মৃত্যুকেও হাসিমুখে বরণ করিয়া লইবে। ইত্যাদি আবেগপূর্ণ অনেক কথাই তলোয়ারকর বলিয়া ফেলিল। কিন্তু রাজীবের বিবাহ তাহারা কোথায় এবং কাহার সহিত স্থির করিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিলে ভারতী বলিল, বিনোদবাবুর বড় মেয়ে মাধুরীর সহিত রাজীবের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা হইয়াছে। ইহাতে সকলেই সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—"এ তো খুব আনন্দের কথা।"

রাজীব যখন কলিকাতায় বিনোদবাবুর বাড়ীতে অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় বিনোদবাবুর বড় মেয়ে মাধুরী রাজীবের

রূপে-গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মনে মনে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। একদিন টেবিলের উপর চা এবং জলখাবার দিয়া মাধুরী যখন ফিরিয়া যাইতেছিল সেই সময় চেয়ারে তাহার পা বাধিয়া গিয়াছিল, রাজীব ক্ষিপ্রতার সহিত মাধুরীর হাত ধরিয়া না-ফেলিলে সে পড়িয়া যাইত। এই ব্যাপারে মাধুরীর সারা মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেও, সলজ্জ হাসির সহিত রাজীবের প্রতি আড়-দৃষ্টিতে চাহিয়া মাধুরী দ্রুত প্রস্থান করিয়াছিল।

রাজীব রেঙ্গুনে চলিয়া যাওয়ার পর, রাজীবের খোঁজ-খবর লইবার জন্য মাধুরী তাহার মাতার নিকট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। মাধুরী-যে রাজীবের প্রতি আসক্ত, মাধুরীর হাব-ভাবে তাহা বিনোদবাবুর বুদ্ধিমতী স্ত্রী সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট সে-বিষয় ব্যক্তও করিয়াছিলেন।

মাধুরীর বিবাহ সম্বন্ধে বিনোদবাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তেমন উপযুক্ত কোন পাত্র তিনি পান নাই। রাজীবকে বিনোদবাবু বেশ ভালরূপই জানেন। রাজীব বর্তমানে রেঙ্গুনে অপূর্বদের অফিসে দেড় শত টাকা মাহিনার একটি চাকুরীও করিতেছে। সুতরাং বিনোদবাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, রাজীবের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই—রাজীবকে জামাতা রূপে পাইলে বরং তিনি খুসিই হইবেন। কিন্তু, রাজীবের অতীত দিনের ইতিহাস স্মরণ করিয়া তিনি স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, রাজীব বোধ হয় বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। যাহা হউক অবশেষে স্ত্রীর পরামর্শে, মাধুরীর সহিত বিবাহে রাজীবকে সম্মত করাইবার সকল দায়িত্ব এক পত্রে ভারতীর উপর অর্পণ করিয়া বিনোদবাবু নিশ্চিন্ত ছিলেন।

রাজীবকে বিবাহে রাজি করাইবার জন্য ভারতী যে-সব যুক্তি-

তর্কের অবতারণা করিল, রাজীব তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবার কিছুই পাইল না এবং তলোয়ারকরের উৎসাহকেও সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। অধিকন্তু, রাজীব যখন ভাবিল—তাহার সহিত মাধুরীর বিবাহ দিবার জন্য বিনোদবাবু স্বয়ং আগ্রহশীল, তখন বিনোদবাবুর নিকট সে বহু বিষয়ে ঋণী, এই কথা চিন্তা করিয়া রাজীব ভারতীকে বলিল,— "আমি দেখ্‌ছি—আমাকে বিবাহে জড়াবার জন্য আপনারা সকলেই এক-মত। কিন্তু, এ-বিষয়ে আমি ভাল ক'রে না-ভেবে আপনাদের কোনো কথা দিতে পারছি না, আপনারা আমাকে কিছুদিন সময় দিন।"

রাজীবের এইরূপ উক্তিতে সকলেই আপাতত কিছু ভরসা পাইল। অতঃপর ভারতী সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করার পর সকলে সেদিন-কার ম'ত ভারতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

রাজীবের নিকট বিবাহের প্রস্তাব কর হইয়াছে, তবে রাজীব এখনও কোন পাকা কথা দেয় নাই, সেই সংবাদ জানাইবার জন্য ভারতী বিনোদবাবুকে একখানা চিঠি লিখিতেছিল। লেখা শেষ করিয়া খামটি আটা দিয়া আঁটিয়া ঠিকানা লিখিতেছে, এমন সময় অপূর্ব অফিস হইতে ফিরিয়া একখানি খবরের কাগজ হাতে অতি বিষন্ন মনে ভারতীর কক্ষে প্রবেশ করিল। ভারতী মুখ তুলিয়া অপূর্বর দিকে চাহিতেই, অপূর্বর চেহারায় অসম্ভব পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া গেল! ভারতীর মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"এ কি, এ-রকম যে?" অপূর্ব একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া, নীরবে খবরের কাগজখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। কাগজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই ভারতী দেখিতে পাইল, প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে :

বিদ্রোহী সব্যসাচীর জীবন-লীলার অবসান। একই সঙ্গে দলের আরও চারি ব্যক্তি নিহত।

এই নিদারুণ সংবাদ পাঠে ভারতীর বুকের মাঝে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তাহার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল! কিছুক্ষণ হেট-মুখে নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকার পর ভারতী মুখ তুলিয়া অপূর্বকে বলিল—"কিন্তু এ-যে আমি মোটেই বিশ্বাস ক'রতে পারছি না।"

ভারতীর মনে পড়িয়া গেল—দেশের এইসব সংবাদপত্র সম্বন্ধে সব্যসাচী একদিন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সংবাদপত্রগুলি সত্য অপেক্ষা বেশীর ভাগ মিথ্যাই বহন করে। সুতরাং সব্যসাচীর মৃত্যুসংবাদকে

ভারতী কিছুতেই অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। গতরাত্রেই ভারতী তাহার ডাক্তার-দাদাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে যে, তাহার বিবাহের সংবাদ পাইয়া সব্যসাচী তাহাদের নিকট আসিয়াছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল যেন কত উজ্জ্বল। বিবাহের শেষে ভারতী অপূর্বর সহিত এক-সঙ্গে সব্যসাচীকে প্রণাম করিতে সব্যসাচী যেন স্মিতহাস্যে উভয়কে আশীর্বাদ করিলেন।

ভারতী তাহার স্বপ্নের কথা প্রাতঃকালে অপূর্বকে জানাইলে অপূর্ব বলিয়াছিল—"তোমার ডাক্তার-দাদা যেখানেই থাকুন, তোমাকে আশীর্বাদ ক'রবার জন্য তোমার আকর্ষণে একদিন তাঁকে আসতেই হবে।"

ভারতী হাসিয়া বলিয়াছিল—"নিশ্চয়ই।"

যাহা হউক, ভারতী অপূর্বকে বলিল—হীরাসিং সিঙ্গাপুরে আছে; গতকল্য পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা তুলিতে গিয়া সে খোঁজ লইয়া জানিতে পারিয়াছে—আগামী সপ্তাহে হীরাসিং সিঙ্গাপুর হইতে ফিরিয়া তাহার কাজে যোগ দিবে। সুতরাং হীরাসিং ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সব্যসাচীর মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা কোন সিদ্ধান্তই ভারতী গ্রহণ করিবে না।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে, একদিন প্রাতঃকালে পিয়ন আসিয়া ভারতীর হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিয়া গেল। টেলিগ্রাম পড়িয়া ভারতী জানিতে পারিল—টেলিগ্রামটি সুরাবায়া হইতে আসিয়াছে—সুমিত্রার খুব অসুখ, ভারতী যেন অপূর্ববাবুকে সঙ্গে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে সুরাবায়া রওয়ানা হয়।

ভারতী টেলিগ্রামের বিষয় অপূর্বকে জানাইল এবং বলিল—সে যেন অফিস হইতে ছুটি লইয়া আসে, কারণ আগামী-কাল প্রাতঃকালের জাহাজেই তাহাদিগকে সুরাবায়া রওয়ানা হইতে হইবে।

ভারতী ভাবিতে লাগিল—এই তো গত সপ্তাহেই সে সুমিত্রার পত্র পাইয়াছে, সুমিত্রাদিদি একরকম ভালই আছেন। অপূর্বর সহিত তাহার বিবাহের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সুমিত্রাদিদি তাহাকে কত আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা জানাইয়াছেন; বিবাহের উপহার স্বরূপ পাঁচশত টাকার একখানা চেকও সুমিত্রাদিদি তাহার নামে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু হঠাৎ আবার সুমিত্রাদিদির কি হইল? ভারতীর সন্দেহ হইল—ডাক্তার-দাদার মৃত্যু সংবাদে নিশ্চয়ই সুমিত্রাদিদির কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে।

রাজীবকে বাড়ীতে রাখিয়া এবং তলোয়ারকরের উপর সমস্ত বিষয় দেখা-শুনা করিবার ভার দিয়া, পরের দিন প্রত্যূষে, অপূর্বকে লইয়া ভারতী সুরাবায়া যাত্রা করিল।

শশী উহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়াই বাসার দিকে চলিয়াছে। আজ তাহার মনটা বড় ভাল নাই। জেটি হইতে নামিয়া রাস্তায় আসিয়া সে আর গাড়ী ভাড়া করে নাই, সমুদ্রের ধারে ধারে হাওয়া খাইতে খাইতে হাঁটিয়াই বাসায় ফিরিবার মনস্থ করিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে অতীত দিনের অনেক কথাই আজ তাহার মনে পড়িয়া গেল—বিশেষ করিয়া নবতারার কথা—তাহাকে ফাঁকি দিয়া তাহার সরল অন্তঃকরণে নবতারা যে ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, একমাত্র সব্যসাচীর উপদেশে কবিতা রচনায় মগ্ন থাকায়, এবং ভারতীদের সঙ্গে নানান আলোচনায় রত থাকায় সে-ক্ষতের বেদনা শশী তেমন অনুভব করে নাই। আজ অপূর্ব এবং ভারতী হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায় সে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিল। সর্বোপরি সব্যসাচী সম্বন্ধে যেরূপ নিদারুণ সংবাদ সেদিন তাহারা পাইয়াছে, তাহা যদি সত্য হয় তবে আর কাহাকে সম্মুখে

রাখিয়া তাহারা তাহাদের পথে অগ্রসর হইবে? ইত্যাদি বহু বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে সে কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে পথ ধরিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে। এমন সময় পিছন হইতে চীৎকার করিয়া একব্যক্তি তাহাকে ডাকিল—"হ্যালো, পোয়েট!" কিন্তু তাহার ডাক শশী শুনিতেই পাইল না। অগত্যা লোকটি দ্রুত অগ্রসর হইয়া আবার ডাকিল—"হ্যালো, পোয়েট!" এইবার শশী পিছন ফিরিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল—হীরাসিং তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। হীরাসিং তাহার নিকটে পৌছিতেই, শশী বলিয়া উঠিল—"আরে, সর্দারজী! —কি খবর? কখন এলে তুমি?"

হীরাসিং বলিল—"Just now."

শশী বলিল—"তা' হ'লে ডেরায় ফিরচো বোধ হয়? চলো, এক-সঙ্গেই যাওয়া যাক্। আচ্ছা ভাই, ডাক্তারের খবর কি বল তো? সেদিন খবরের কাগজে যা' প'ড়লাম তাতে আমাদের দেহ-মন একেবারে ভেঙে গিয়েছে। আমরা তোমার কাছে ঠিক খবর জানবার আশায় প্রতি-মুহূর্ত তোমার আসার পথ চেয়ে আছি। ডাক্তার বেঁচে আছেন তো, ভাই?"

হীরাসিং উত্তরে জানাইল—চিন্তার কোন কারণ নাই, সব মঙ্গল। বাসায় ফিরিয়া সমস্ত খবর সে সবিস্তারে জানাইবে।

সংবাদ শুনিয়া শশী আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। তাহার দেহে যেন নূতন ভাবে প্রাণ সঞ্চার হইল। আনন্দাতিশয্যে সে গুন্ গুন্ করিয়া একটি গান ধরিয়া দিল:

আর তো মোরা করি না ভয়
চেয়ে ভাখো ঐ আসিছে জয়।

হেরি পূরব-গগনে অরুণ ভাতি,
পোহাল আজিকে সব দুখ-রাতি।
যেন ঐ নবারুণ ঘোষিছে বারতা ঃ
পিছনে তোদের আছে রে বিধাতা—
কামনা তোদের হবে যে পূর্ণ—
ধরণীর যত ধুলা হবে রে, হবে ধন্য।

গান থামাইয়া শশী হীরাসিংকে বলিল—"আহা, আর একটা দিন আগে এসে পৌছতে পারলে না? তা' হ'লে ভারতীও সুখবরটা শুনে যেতে পারত।"

হীরাসিং বলিল—"কেন, তিনি কোথায় গেলেন?—আরে, মাষ্টারের জন্যেই তো আমি তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম তোমাদেরকে সব খবর জানাবার জন্যে, নইলে আরও দু'চারদিন আমার সিঙ্গাপুরে থাকার দরকার ছিল।"

শশী হীরাসিংকে সুমিত্রার টেলিগ্রামের কথা এবং টেলিগ্রাম পাইয়া অপূর্ব ভারতীর সুরাবায়া যাত্রার বিষয় বলিল; সে তাহাদিগকে এইমাত্র জাহাজে তুলিয়া দিয়া বাসায় ফিরিতেছে, ইত্যাদি সমস্তই জানাইল। একটি ভাড়াটিয়া গাড়ীর কোচমান শশী এবং হীরাসিংকে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিল—"আইয়ে বাবুজি, গাড়ী 'পর বইঠিয়ে, ম্যায় পহুচা দুঙ্গা।"

কোচম্যানের কথায় শশী হীরাসিংকে বলিল—"চল সর্দারজী, আর হেঁটে গিয়ে কাজ নেই।" এই বলিয়া শশী হীরাসিংএর হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। ভাড়াটিয়া গাড়ী তাহাদিগকে লইয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে রওয়ানা হইল।

১৬

সুমিত্রা সুরাবায়ায় আসিয়া সব্যসাচীর উপদেশ ম'ত একজন বিজ্ঞ উকিলের সাহায্যে তাহার খুল্লতাত প্রদত্ত বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত অধিকার বুঝিয়া লওয়ার পর, একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর সাহায্যে সমস্ত কাজ-কর্ম পরিচালনা করিতেছিল। কিন্তু সব্যসাচীর সম্বন্ধে প্রাণে একটা উৎকণ্ঠা এবং মনে গভীর দুশ্চিন্তা লইয়াই সে দিনযাপন করিতেছিল। কাজেই সুমিত্রার তেমন স্ফূর্তি বা আনন্দ ছিল না। এইরূপ নিরানন্দ জীবন যাপনের ফলে তাহার দেহ ক্রমশঃ কৃশ হইয়া পড়িতেছিল। ভারতীর সন্দেহ মিথ্যা নয়—সুমিত্রা যেদিন সংবাদপত্রে সব্যসাচী সম্বন্ধে নিদারুণ সংবাদ জানিতে পারিল, কঠিন আঘাতে সেই দিন তাহার হৃদয় ভাঙিয়া পড়িল। কারণ সব্যসাচীর চরম-পরিণতি সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই তাহার মনে একটা আতঙ্ক লাগিয়া ছিল। সুতরাং সব্যসাচীর মৃত্যু-সংবাদকে সুমিত্রা একেবারে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল। এই অবস্থায় সুমিত্রা যেদিন শয্যা গ্রহণ করিল সেইদিন বৈকালে লোকজন ডাকাইয়া সুমিত্রা তাহার সমস্ত সম্পত্তি ভারতী এবং অপূর্বর নামে এক উইলপত্র সম্পাদন করিয়া ভারতীকে সুরাবায়ায় আসিবার জন্য রেঙ্গুনে তার করিল।

দুইদিন হইল, অপূর্ব এবং ভারতী সুমিত্রার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুমিত্রার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহারা হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিল। ভারতী সুমিত্রাকে বলিল, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাহার ডাক্তার-দাদা জীবিত আছেন। ভারতীর কথায় সুমিত্রা একটু মৃদু হাসিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর করিল,—"তোমার বিশ্বাসই সত্য হ'ক,

ভারতী, কিন্তু আমার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে। তবু সত্যিই তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তবে এই শেষের দিনে তাঁর পায়ে মাথা রেখে আমি যদি যেতে পারতাম তবে আমার আর কোনো ক্ষোভই থাক্‌তো না, ভারতী!"

সুমিত্রার কথা শেষ হইতেই, একজন চাকর আসিয়া খবর দিল—কে একজন ভদ্রলোক সুমিত্রার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। অল্পক্ষণ পরেই ম্যানেজারের সহিত যে-ব্যক্তি আসিয়া সুমিত্রার কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিয়া ভারতী সুমিত্রার বিছানা হইতে লাফাইয়া নীচে নামিয়া বলিয়া উঠিল,—"এই যে, ডাক্তার-দাদা! তোমাকে দেখবার জন্যই সুমিত্রা-দিদি এখনও বেঁচে আছে।"

সব্যসাচী আসিয়া নীরবে সুমিত্রার পাশে বসিলেন এবং সুমিত্রার কপালে হাত দিয়া বুঝিতে পারিলেন—প্রবল জ্বর! সুমিত্রা সব্যসাচীর হাতখানি নিজের দুই হাত দিয়া কপালে চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিল,—"এসেছ, সত্যিই তুমি এসেছ?"—

সব্যসাচী শান্তকণ্ঠে বলিলেন,—"ব্যস্ত হ'য়ো না, সুমিত্রা, ঈশ্বরকে স্মরণ কর।"

সব্যসাচীর কথায় সুমিত্রার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সুমিত্রা অতি ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—"তুমি ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় ঈশ্বর কে আছে ব'লতে পার? মরণকে তো আমার কোনো ভয় নেই ডাক্তার! আজ আমার ম'ত সুখী জগতে ক'জন?—কই, তোমার পা-দু'খানা এগিয়ে দাও,—যে-জীবন একদিন তুমি দান করেছিলে; আজ সেই-জীবন তোমার চরণে উৎসর্গ ক'রে জীবনকে আমার ধন্য করি!"—

সুমিত্রা আর কথা বলিতে পারিল না—ধীরে ধীরে হাত-বাড়াইয়া সব্যসাচীর পাদস্পর্শ করিয়া নিজের মস্তকে ছোঁয়াইল। ক্রমশঃ সুমিত্রার

সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। সব্যসাচী নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—জ্বর ছাড়িয়া গিয়া নাড়ী ক্রমশঃ হিম এবং নিশ্চল হইয়া আসিতেছে। তিনি সুমিত্রাকে বলিলেন,—"কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই তোমাকে যেতে হ'ল, সুমিত্রা! কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা কথা জেনে তুমি তৃপ্ত হও—আমাদের ঘরের শত্রু—ব্রজেন্দ্রের ইহলীলা আমি সাঙ্গ ক'রেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের গতিও অন্যপথ অবলম্বন ক'রেছে—আমি জগন্মাতার সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ ক'রেছি, তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশ ব্যতীত কোনো কাজই আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়!"

সব্যসাচীর কথা শেষ হইতেই, সকলে লক্ষ্য করিল—সুমিত্রার মুখমণ্ডল হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং পর মুহূর্তেই সুমিত্রা শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সব্যসাচী সুমিত্রার হাতখানি ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন,—"সব শেষ হ'য়ে গেল, ভারতী।"

ভারতী আবেগভরে কাঁদিয়া উঠিতেই সব্যসাচী ভারতীর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেনঃ "আত্মীয় স্বজনের বিয়োগে শোক বা অনুতাপ করা আমাদের একেবারেই নিষেধ, ভারতী!—সুমিত্রার ইহজীবনের প্রয়োজন শেষ হ'য়েছে, তাই সে চ'লে গেল। জগন্মাতার ইচ্ছা সম্পূর্ণ করবার জন্য দেহ পরিবর্তনের আবশ্যক হয়। নূতন দেহ এবং নূতন প্রেরণা নিয়ে আবার সুমিত্রাকে আমাদের মাঝে ফিরে আসতে হবে। শোকে অধীর হ'লে চ'লবে না—মায়ের কাজের জন্য আমাদের প্রস্তুত হ'তে হবে।"

সব্যসাচীর এইরূপ সান্ত্বনাপূর্ণ উপদেশে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া ভারতী সব্যসাচীর মুখের প্রতি চাহিল—সব্যসাচীর রূপের একি অপরূপ পরিবর্তন!—ভারতী স্বপ্নে সব্যসাচীর যে উজ্জ্বল মূর্তিটি দর্শন করিয়াছিল, এ সেই মূর্তি!—ভারতী গভীর উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল,—"আশীর্বাদ কর,

দাদা! তোমার এই মূর্তিটিকে আমাদের ইহ-জীবনের ধ্যানের মূর্তিরূপে আমাদের সামনে উজ্জ্বল রেখে, আমরা যেন আমাদের পথে এগিয়ে চ'লতে পারি।"—এই বলিয়া ভারতী তাহার মস্তক সব্যসাচীর পদদ্বয়ের উপর রাখিয়া প্রাণে গভীর শান্তি এবং তৃপ্তি অনুভব করিল! অপূর্ব্বর চোখ দিয়া এতক্ষণ নীরবে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে-ও ভারতীকে অনুসরণ করিয়া সব্যসাচীর পদযুগলে নিজের মস্তক ছোঁয়াইয়া সুমিত্রার বিয়োগ-জনিত বেদনায় যথেষ্ট উপশম বোধ করিল।

* * *

নিমাইবাবু সিঙ্গাপুরে সব্যসাচীর নিকট বিদায় লইয়া আসার কয়েকদিন পরে, সব্যসাচী যখন জানিতে পারিলেন—সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তখন সুমিত্রাকে তাঁহার স্মরণ হইল। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে সুমিত্রার অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা সব্যসাচী ভালরূপেই জানিতেন। ইহা ছাড়া সব্যসাচী বিভিন্ন স্থানে তাহার দলের একান্ত অনুগত ব্যক্তিদের কথাও চিন্তা করিলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকার পর সব্যসাচী বিজন এবং অচলাকে, তাঁহার সম্বন্ধে সত্য সংবাদ জানাইবার জন্য বিভিন্নস্থানে প্রেরণ করিলেন, এবং আর কাল বিলম্ব না করিয়া, হীরাসিংকে রেঙ্গুনে রওয়ানা হইবার নির্দেশ দিয়া তিনি নিজে সুমিত্রার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ইহার পরের ঘটনা পাঠক পাঠিকাগণ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সুমিত্রার এইরূপ অকাল-বিয়োগের দুঃখ এবং ক্ষতি সব্যসাচী যেরূপ গভীরভাবে উপলব্ধি করিতেছেন, সেরূপ বোধ হয় আর কেহই করে নাই, কিন্তু তিনি এত দুঃখেও বিচলিত নহেন। কারণ সব্যসাচী আজ সেই বস্তু লাভ করিয়াছেন—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

সুমিত্রার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক গাম্ভীর্যপূর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে অনাড়ম্বরের সহিত নিষ্পন্ন হইল। সুমিত্রার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সব্যসাচীর নির্দেশে 'পথের দাবী'র বিশ্বস্ত এবং একনিষ্ঠ কর্মীরা সব একে একে সুরাবায়ায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তলোয়ারকর তাহার এক বন্ধুর উপর ভারতীর গৃহ দেখা-শুনা করার ভার অর্পণ করিয়া রাজীব এবং শশীকে সঙ্গে লইয়া রেঙ্গুন হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বহুদিন পরে সকলে সব্যসাচীর দর্শন লাভ করিয়া অন্তরে এক নূতন আশা এবং তৃপ্তি পাইল।

পরের দিন সব্যসাচী ভারতীকে নির্দেশ দিলেন যে, বৈকাল ৫টার সময় 'পথের দাবী'র সভ্যরা সকলে যেন হলঘরে উপস্থিত হয়। কারণ সভ্যদের উদ্দেশে তাঁহার যে বক্তব্য আছে তাহা তিনি আজ সকলের নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে চান।

ভারতী সব্যসাচীর নির্দেশ সকলকে জানানোর পর, 'পথের দাবী'র সভ্যবৃন্দ সকলে নির্দিষ্ট সময়ে হলঘরে উপস্থিত হইয়া নীরবে সব্যসাচীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘড়িতে টং টং শব্দে চারিটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই সব্যসাচী ধীর পাদক্ষেপে সভাকক্ষে প্রবেশ করিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলেন। সব্যসাচীর উপস্থিতিতে সভাকক্ষ যেন অধিকতর গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ হইল। অল্পক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকার পর, সব্যসাচী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীর শান্ত কণ্ঠে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

"বন্ধুগণ!

এই পৃথিবীর বুকে মানবের জীবন-যাত্রার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, বিশেষ ক'রে আমাদের মাতৃভূমি—ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে

শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে জাতির আত্ম-বিকাশের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য, আমরা যে-পথ গ্রহণ ক'রেছিলাম, সেই পথে চ'ল্‌বার জন্য তোমরা জীবনের সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলে—মৃত্যুকে পর্যন্ত উপেক্ষা ক'রে আজও অটল ভাবে সেই পথে তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছ। সংকল্প সাধনের জন্য আমাদের বহু সহকর্মীকে তাদের অমূল্য জীবন বিসর্জন দিতে হ'য়েছে। কিন্তু, সেইসব একান্ত কর্তব্যনিষ্ঠ এবং নির্ভীক কর্মীদের এইরূপ মহান ত্যাগ সত্ত্বেও আমরা আজও আমাদের লক্ষ্যে পৌছতে পারিনি—আমাদের চলার পথে বহু বাধা এসে উপস্থিত হ'য়েছে। কিন্তু যে-বাধা আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত ক'রেছে, সে-বাধা আমাদের শত্রুপক্ষের বাধা নয়—সে-বাধা আমাদের দলগত মতবৈষম্যের বাধা। শত্রুপক্ষের কোনো বাধাই আমাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ ক'রতে পারেনি। সারা পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় স্থানে আমরা আমাদের শক্তিশালী দল গঠনে সক্ষম হ'য়েছিলাম—গবর্ণমেণ্টের চোখে কি ক'রে ধূলি নিক্ষেপ ক'রতে হয়, তা' আমরা ভাল ভাবেই জানি!—সরকার বাহাদুরের প্রায় সকল বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো না কোনো পদে আমাদের দলের বিশ্বস্ত কর্মীরা নিযুক্ত আছে। এ আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কম সাফল্য নয়।

আমাদের চলার পথে আংশিকভাবে এরূপ সফলতা লাভ করা সত্ত্বেও আমরা আমাদের লক্ষ্যের বহু পিছনে প'ড়ে আছি। আমাদের দলের ভিতর আত্ম-কলহের জন্য যে-ভাঙন আজ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তার একমাত্র কারণ—আমাদের কতকগুলি কর্মীর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এবং ব্যক্তিগত সব তুচ্ছ বৃত্তি চরিতার্থের জন্য তাদের উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তি! কিন্তু তাদের এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য আমি মোটেই

তাদেরকে দোষী ক'রতে চাই না। কারণ—মানসিক উত্তেজনা এবং অপরিপক্ক দৃষ্টি নিয়ে, যে-কোনো পন্থাই আমরা অবলম্বন করি না কেন, সে-পথে এই সব গোলযোগ এবং বাধা চিরদিনই আসবে।

আমি স্বীকার করি আমাদের সকলেরই লক্ষ্য এক এবং আমরা সকলে-যে মহান উদ্দেশ্য সাধন ক'রতে কৃতসংকল্প তার পিছনে কারও কোনো কপটতা নাই। কিন্তু, আমাদের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত ক'রবার জন্য যে-পথ আমরা গ্রহণ ক'রেছি, সে-পথ ধার করা পথ এবং তা' বিজাতীয় ভাবধারা ও কর্মনীতির অনুকরণ মাত্র। এরূপ-ভাবে প্রাণের আবেগ নিয়ে এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থের প্রচ্ছন্ন মনোবৃত্তি নিয়ে যে-পথেই আমরা অগ্রসর হই না কেন, সে-পথে জগতে মানবের কল্যাণকর কোনো ব্যবস্থাই আমরা চিরস্থায়ীরূপে প্রবর্তন ক'রে যেতে পারবো না।

আজ জগতের সকল ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার জন্য মহাশক্তি স্বয়ং এই পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণা হ'তে চাইছেন। কিন্তু, তিনি তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ ক'রবেন—তাঁর ইচ্ছার প্রতি ঐকান্তিক ভাবে সমর্পিত বিশুদ্ধ মানব-আধারকে অবলম্বন ক'রে। সুতরাং আজ আমাদের পক্ষে অতি অবশ্য প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে—আমরা যে কর্মপন্থা অবলম্বন ক'রেছি, তার পরিবর্তন সাধন করা। নিম্ন-প্রাণের আবেগ এবং অনিশ্চিত ভ্রান্ত-চেতনার দ্বারা আর পরিচালিত না-হ'য়ে আজ আমাদের উপলব্ধি ক'রবার সময় এসেছে—আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাধারার উপরে যে মহাশক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন, সেই চিন্ময়ী শক্তি আমাদের কোন্ পথে চালিত ক'রতে চান। সেই উপলব্ধির জন্য আমাদের অনুসৃত কর্ম-প্রবাহের গতি আমাদের ফেরাতেই হবে।

তোমরা ঘুণাক্ষরেও এ-কথা মনে স্থান দিও না যে, আমি তোমা-দেরকে কর্মবিমুখতার দুর্বল নীতি গ্রহণ ক'রতে ব'লছি। কারণ—কর্ম-বিমুখতা মানবের জীবনে কখনই পূর্ণতা এনে দেয় না। এতোদিন আমরা আমাদের কর্মের গতি যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছি তা সম্পূর্ণ অজ্ঞানের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে। কাজেই আমাদের কর্মের পূর্ণ সফলতা লাভে আমরা বঞ্চিত হ'য়েছি। আজ গভীর নীরবতার মাঝে অন্তরের পরিপূর্ণ স্থৈর্যলাভের দ্বারা আমাদের উপলব্ধি ক'রতে হবে—আমাদের প্রকৃত পথ এবং প্রকৃত কর্ম কি?—তোমাদের মধ্যে যাদের আমার উপর পূর্ণ আস্থা আছে, তারা আমাকে অনুসরণ ক'রতে পার—তার ফলে তোমাদের ব্যক্তিগত-জীবনে এবং তোমাদেরকে অবলম্বন ক'রে সমাজ ও জাতির জীবনে নিশ্চয়ই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা হবে।"

সভাস্থ সকলে গভীর শ্রদ্ধার সহিত নীরবে সব্যসাচীর বক্তব্য শুনিতেছিল। সব্যসাচীর বক্তৃতা শেষ হইতেই, সকলে একে একে সব্যসাচীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করতঃ নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিল।

অপরাপর কাজে দুইদিন অতিবাহিত হওয়ার পর, একদিন প্রাতঃ-কালে সব্যসাচী তাঁহার কক্ষে ভারতী এবং অপূর্বর সহিত সুমিত্রার বিষয়-সম্পত্তির একটা বিধি-ব্যবস্থা করার বিষয়ে আলোচনায় রত আছেন। রাজীবও তথায় উপস্থিত আছে।

ভারতী বলিল,—"সুমিত্রাদিদি তাঁর বিষয়-সম্পত্তি আমাদের নামে উইল ক'রে গিয়ে আমাদের মহা সমস্যায় ফেলে গিয়েছেন। ভাগ্যিস আপনি এসে প'ড়েছেন, দাদা, নইলে আমরা তো ভেবে কিছুই কুল-কিনারা পাচ্ছিলাম না।"

সব্যসাচী বলিলেন,—"তোমাদের ছাড়া অপর কোনও নির্ভরযোগ্য পাত্র সুমিত্রার চোখে পড়েনি ব'লেই সে তার সমস্ত সম্পত্তি তোমাদের নামে উইল ক'রে দিয়ে শান্তিতে যেতে পেরেছে।"

অপূর্ব বলিল,—"এখন আমরাও সুমিত্রার বিষয়ের যথাযথ বিধি-ব্যবস্থা ক'রবার সব ভার এবং অধিকার আপনার উপর অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে রেঙ্গুনে ফিরতে চাই। কারণ সেখানে অফিসে আমার অনেকগুলো জরুরী কাজ শেষ ক'রবার আছে। আপনি ভারতীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভাল বোঝেন, করুন।"

সব্যসাচী ভারতীর প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"ভারতী, এ বিষয়ে তোমার কি মত?"

ভারতী বলিল,—"দাদা, এ-বিষয়ে আমার কোনো মত চাওয়া মানে —আমাকে লজ্জা দেওয়া আর বিপদে ফেলা। আমরা আপনার হাতের পুতুল মাত্র—যেদিকে আমাদের চালাবেন, আমরা সেইদিকেই চ'লবো। তবে সুমিত্রাদিদি রেঙ্গুন হ'তে চ'লে আসবার সময় যে দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে এসেছেন, তা' সারাজীবন ধ'রে আমাকে পালন ক'রে চ'লতে হবে। সুমিত্রাদিদির জীবনের প্রধান ব্রত ছিল—দেশের অশিক্ষিত সন্তানদের শিক্ষিত ক'রে তোলা। সুতরাং দেশ হ'তে নিরক্ষরতা দূর ক'রে সমাজে প্রকৃত শিক্ষা প্রবর্তন ক'রতে যদি তাঁর সম্পত্তির আয়ের সমস্তই ব্যয় হয়, তবে তা-ও আমাদের ক'রতে হবে।"

ভারতীর এইরূপ মন্তব্যে সব্যসাচী উত্তর করিলেন,—"ঠিক ব'লেছ, ভারতী! শিক্ষার অভাবে আমাদের দেশ অনেক বিষয়ে জগতের অপরাপর দেশের চেয়ে যে কত পিছনে প'ড়ে আছে, সে-সত্য সুমিত্রা মর্মে মর্মে অনুভব ক'রেছিল। সুমিত্রার সংকল্পকে আমরা যদি কার্যকরী ক'রে

তুলতে পারি, তবে তার স্মৃতির প্রতি আমরা প্রকৃত সম্মান দেখাতে পারবো।··· হ্যাঁ, ব্যাঙ্কের হিসেব তুমি দেখেছিলে, ভারতী? ব্যাঙ্কে মোট কত টাকা জমা আছে, দেখলে?"—

ভারতী বলিল—বিভিন্ন ব্যাঙ্কের পাশ-বুকের হিসাব একত্র করিয়া সে দেখিয়াছে—মোট দুই কোটী, পঁয়তাল্লিশ লক্ষ, চুয়াত্তর হাজার, তিন শত সাত টাকা, বার আনা নয় পাই ব্যাঙ্কে জমা আছে। ইহা ব্যতীত ভারত সুগার কোম্পানীর শেয়ারের এক তৃতীয়াংশই সুমিত্রার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং জমিদারীর আয়—বাৎসরিক প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা।

সব্যসাচী ভারতীকে বলিলেন যে, ম্যানেজারকে যেন নির্দেশ দেওয়া হয় আগামী কাল এস্টেটের হিসাবের সমস্ত খাতা-পত্র নিয়ে তাঁহার সহিত দেখা করেন।

রাজীব একপাশে নীরবে বসিয়া ছিল, রাজীবের প্রতি চাহিয়া সব্যসাচী বলিলেন,—"রাজীব! আমি তোমার পরিচয় ভারতীর কাছে সব জানতে পেরেছি। তুমি আপাতত ক'লকাতায় ফিরে গিয়ে রুদ্রতেজের সঙ্গে সেখানকার কাজে যোগ দাওগে।"—সব্যসাচীর কথা শেষ না হইতেই, হঠাৎ সেখানে বিজনের সহিত একব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগন্তুককে দেখিয়া সব্যসাচী বলিয়া উঠিলেন,—"এই-যে, নিমাইবাবু,—আসুন. আমি আপনার অপেক্ষাই ক'রছিলাম। অপূর্ব আর ভারতী সুমিত্রার এস্টেটের দায়িত্ব আমার উপর চাপিয়ে রেঙ্গুনে চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু, আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি, আমাকে আবার বেরোতে হবে; আমি একজন উপযুক্ত লোকের প্রতীক্ষায় ছিলাম,—আপনি এসে প'ড়েছেন ভালই হ'য়েছে। অচল, বিজন আর শশীও এখানে আছে, এদের নিয়ে আপনি এখানকার কাজ-কর্ম সব দেখা-শোনা করুন।—রাত্রি

জেগে এসেছেন, যান, মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নিন। 'পথের দাবীর' কর্মীদের আমার যা' ব'লবার ছিল, সেদিন আমি প্রায় সবই ব'লেছি, কিন্তু আপনি অনুপস্থিত ছিলেন। আপনি আসুন, আমি আজ সংক্ষেপে আরও কিছু আপনাদের ব'লবো।"

কিছুক্ষণ পরে নিমাইবাবু ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদ পাইয়া দলের অন্যান্য সকলেও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আমি সেদিন তোমাদের প্রায় সবই ব'লেছি, আজ আরো পরিষ্কার ক'রে ব'লছি, শোন—

"ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আজ আমি নিশ্চিন্ত—ভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধানে ভারতের স্বাধীনতা একদিন আসবেই—সংসারের কোনো শক্তি, কোনো বাধা তা' ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা আমাদের মাতৃভূমির মুক্তি অবশ্যই চাই। কিন্তু তার চেয়েও বড় জিনিষ সমগ্র মানবজাতির মুক্তি এবং তা আসবে শুধু অধ্যাত্ম-সিদ্ধির পরিপূর্ণতাকে অবলম্বন ক'রে। আর জগৎকে সে-মুক্তির পথ দেখাবে একমাত্র ভারত। কিন্তু সেজন্য আজ চাই ভারতে ব্যাপক আধ্যাত্মিক আন্দোলন। তাই, আধ্যাত্মিক জাগরণে জাতিকে জাগিয়ে তোলাই হোক আমাদের জীবনের মহাব্রত। এই আধ্যাত্মিকতার আভাস আমি পেয়েছি। কিন্তু জীবনে তাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করবার জন্য আবার আমাকে নিরুদ্দেশযাত্রা ক'রতে হবে। কারণ এর জন্য চাই পথ-প্রদর্শক, উপযুক্ত গুরু। আমি বিশ্বাস করি—এই পুণ্যভূমি ভারতে এমন গুরু নিশ্চয়ই আছেন, যেমন ক'রে পারি তাঁকে খুঁজে বের ক'রবো। তারপর তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে প্রয়োজনীয় সাধনার দ্বারা নিজেকে জগন্মাতার কর্মের নিখুঁত যন্ত্র ক'রে গ'ড়ে তুলবো। তার পর, কেবল তার পরই আমার দ্বারা দেশের কাজ,

জগতের কাজ প্রকৃতভাবে হ'তে পারবে। অবশ্য সেজন্য আরও কিছু সময় লাগবে, কিন্তু ভগবানের কাজের জন্য তৈরি হ'তে হ'লে সময়ের প্রয়োজন। সেজন্য অধীর হ'লে চ'লবে না—অসীম ধৈর্য নিয়ে তোমাদের অপেক্ষা ক'রতে হবে। আমি যতদিন না তোমাদের মাঝে পুনরায় ফিরে আসি, ততদিন তোমরা যে যেমনভাবে পার যতটা পার, কাজের ভিতর দিয়ে নিজেদের তৈরি কর। বিয়ে ক'রে সংসারীই হও, অথবা সমাজ-সেবক, দেশ-সেবক হও—নিজের নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবে এবং সবকিছুই ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ করবে। এ হচ্ছে গীতার নির্দ্দেশিত কর্মযোগ। গীতা কর্মযোগের প্রকৃষ্ট শাস্ত্র, তাই তোমাদের সকলের প্রতি আমার উপদেশ—সকলে গীতা প'ড়বে, গীতার শিক্ষানুযায়ী জীবন ও কর্মকে গঠন করবে। গতানুগতিক লোকাচার-মূলক কর্মানুষ্ঠান নয়, আবার সন্ন্যাসী হ'য়ে সংসারত্যাগও নয়। গীতার নির্দেশমত সংসারে সকল কাজের মধ্যে থেকে চিত্তের সমতা অভ্যাস কর। এর দ্বারাই তোমরা নিজেদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হবে। দেশ হ'তে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হও এবং দেশের সর্ব্বত্র গীতার প্রকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে দাও। এর বেশী এখন আর কিছু আমি তোমাদের ব'লতে পারবো না। নিজ নিজ অন্তরাত্মার প্রেরণায় তোমরা এগিয়ে চলো।"

সব্যসাচীর উপদেশ ম'ত পথের দাবীর কলিকাতা শাখায় রুদ্রতেজের সহিত কাজে যোগ দেওয়ার পর, রাজীব সেখানে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর গীতা-পাঠের ভার গ্রহণ করিয়াছে, বহু শ্রোতা আসিয়া নিয়মিতভাবে পাঠচক্রে যোগ দেয়।

সেদিন গীতাপাঠ শেষ হইলে একে একে সব শ্রোতা চলিয়া যাওয়ার পর একটি অল্পবয়স্কা বিধবা মহিলা উঠিয়া আসিয়া রাজীবকে প্রণাম করিয়া মুখ তুলিয়া রাজীবের দিকে চাহিতেই রাজীব অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল,—"এ কি, অরুণা না?—এ-বেশ যে তোমার?"—

"হ্যাঁ, রাজীবদা, তোমাদের সেই অরুণা। কিন্তু তুমি-যে এতো সহজেই আমাকে চিনতে পারবে, তা' ভাবিনি।"

রাজীব বলিল—"বোস, কি ব্যাপার বল তো,—এখানে তুমি কোথায়?"

অরুণা বলিল,—"এখানে আমার শাশুড়ীর বাপের বাড়ী। প্রায় একমাস হ'ল আমরা এখানে এসেছি, শিগগির আমাদের মহেশপুরে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু, তুমি একবার আমাদের বাড়ী যাবে, রাজীবদা? —এখান হ'তে বেশী দূর নয়, কাছেই। আমার শাশুড়ীও সেদিন এখানে এসেছিলেন, তোমার গীতার ব্যাখ্যা শুনে তিনি খুব সন্তুষ্ট হ'য়েছেন। তুমিই-যে এখানে গীতাপাঠ কর, তা' তো জানতাম না; সেদিন আমরা শুনলাম, এখানে একজন খুব ভাল বক্তা সুন্দর গীতাপাঠ করেন, কিন্তু এখানে এসে-যে আমি তোমাকে দেখতে পাবো, এ আমি কোনোদিন কল্পনাও

করতে পারিনি! শুনেছিলাম, তুমি রেঙ্গুনে কোথায় আছ। সেদিন প্রথম তোমার ব্যাখ্যা শুনে গিয়ে, আমার শাশুড়ী তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় যখন শুন্‌লেন যে, তুমি আমাদেরই গ্রামের এবং সম্পর্কে তুমি আমার দাদা হও, তখন তিনি তোমাকে আমাদের বাড়ী একবার যাওয়ার জন্য তোমায় ব'লতে ব'ল্‌লেন। তুমি একবার আমাদের বাড়ী চলো না, রাজীবদা?"

রাজীব বলিল, "তুমি যখন ব'ল্‌ছ, তা' না-হয় একদিন যাবো, কিন্তু তোমার খবর তো আমি কিছুই জান্‌তে পার্‌লাম না, তোমার এ-অবস্থা কতদিন?"

অরুণা রাজীবকে সংক্ষেপে বলিল যে, তাহার বিবাহের কিছুদিন পরেই, তাহার স্বামী অত্যধিক মদ্যপান এবং শরীরের প্রতি নানান অত্যাচারের ফলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। রোগের কথা টের পাওয়া সত্ত্বেও সে সমানে অত্যাচার করিতে থাকে। অরুণা এবং তাহার শাশুড়ী একপ্রকার জোর করিয়াই তাহার স্বামীকে চিকিৎসার জন্য কাসিয়াংএ লইয়া গিয়া এক যক্ষ্মা নিবাসে ছয়মাস রাখে। সেখানে তাহার রোগ প্রায় পোনেরো আনাই সারিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া সে আবার তাহার পুরাতন অভ্যাসম'ত চলিতে লাগিল, তাহার ফলে অসুখের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। পুনরায় চিকিৎসার জন্য স্বামীকে লইয়া প্রায় একমাস পূর্বে তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু এতো চেষ্টা করিয়াও স্বামীকে বাঁচাইতে পারে নাই গত সপ্তাহে তাহার স্বামী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোগের সকল জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

অরুণা রাজীবকে তাহাদের সংসারের দুঃখের কথা জানাইতে গিয়া আরও বলিল, ছয় মাস পূর্বে তাহার পিতৃদেবও তাহাদের ত্যাগ করিয়া

সংসার হইতে চিরবিদায় লইয়াছেন, তাহার মা শোকে অত্যধিক কাতর হইয়া পড়ায়, অরুণার দাদামহাশয় আসিয়া তাঁহার কন্যাকে তাঁহার বেনারসের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছেন।

রাজীব অরুণার এইসব শোকের কাহিনী শুনিয়া বলিল,—"তা' হ'লে খুড়ীমার মনের অবস্থা তো খুবই মর্মান্তিক!—শোকের একটা অবস্থা হ'তে সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে না-উঠ্‌তেই আবার তাঁকে তোমার অদৃষ্টের এই পরিণতির কথা শুন্‌তে হ'ল!"

অরুণা বলিল,—"হ্যাঁ, টেলিগ্রাম ক'রে কাশীতে মাকে খবর দেওয়া হ'য়েছে, মহেশপুরে ফিরে গিয়ে মাকে একটা চিঠি লিখবো। তা' হ'লে আমি এখন উঠি, রাজীবদা—তুমি কাল বিকেল ৪টের সময় আমাদের বাড়ী আস্‌ছো তো?"—

রাজীব বলিল,—"বেশ, একজন লোক পাঠিয়ে দিও। কিন্তু, আমাকে ৬টার মধ্যেই ফির্‌তে হবে।"

পরের দিন রাজীব যথাসময়ে অরুণাদের বাড়ী আসিয়া অরুণার শাশুড়ীর অনুরোধে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিতেছে। রাজীব যখন নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিল:

দেহিনোঽস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২।১৩

শ্লোকটি শুনিয়া অরুণার শাশুড়ী উহার ব্যাখ্যা একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবার জন্য রাজীবকে বলায়, রাজীব বলিতে লাগিল:

লীলার জন্য ভগবান এই জগৎ সৃষ্টি ক'রে স্বয়ং বহুরূপে প্রকট হ'য়েছেন, এবং সৃষ্টির ক্রমবিকাশে মানব-দেহ গ্রহণ ক'রে আত্মা ক্রমেই এগিয়ে চ'লেছেন—তাঁর স্বরূপ-উপলব্ধির দিকে; প্রত্যেক মানুষের অন্তরাত্মায়

ভগবান অংশরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং মানবের এই দেহ, আত্মারই দেহ। কিন্তু অজ্ঞানের বশে আমরা এই দেহকে 'আমাদের দেহ' বলি। আত্মার এই দেহে কৌমার, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য যেমন একটির পর একটি আসে, সেইরূপ এক শরীর ত্যাগের পর আত্মা অন্য শরীর গ্রহণ করে। যে-ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে, আত্মার শান্তিতে বাস করেন, সেই ধীর, শান্ত, জ্ঞানী ব্যক্তি দেহের বিনাশে বিচলিত বা বিমূঢ় হন না। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বাহ্য ঘটনাবলীর অন্তরালে যে-সত্য নিহিত আছে, পুনঃ পুনঃ এইরূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে মানুষ-যে ক্রমশঃ অমৃতত্বের পানে এগিয়ে চ'লেছে, সেই সত্য জ্ঞানীব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেন, তিনি সংসারের সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় শোকে অধীর বা মুহ্যমান হন না। কারণ জ্ঞানীব্যক্তি সর্বদাই আত্মজ্ঞানে ভরপুর থাকেন, তিনি আত্মাকে জানেন ঃ

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২।২০

এই আত্মা কখনও উৎপন্ন হয় না বা মরে না, বা ইহা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় বিনাশপ্রাপ্ত হয় ইহাও নহে। ইহা অজাত, নিত্য, শাশ্বত, পরিণাম-শূন্য—শরীর হত হইলেও ইহা হত হয় না।

রাজীব আরও বলিল,—"সত্যিই, ধর্ম-সমন্বয়ের বিষয়ে, বিশেষ ক'রে আমাদের এই মানব-জন্মের সব সমস্যার সমাধান ক'রে তাকে প্রকৃত সার্থকতা প্রদানের উদ্দেশ্যে এক অভিনব রূপে গ'ড়ে তোলার জন্য গীতার শিক্ষা যে কী অমূল্য এবং প্রয়োজনীয় তা' ভেবে ঠিক করা যায় না! যে-দেহাত্মবোধ আমাদের চেতনাকে নীচের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে,

প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ, এই আকর্ষণ এবং বদ্ধতা হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্ত গীতায় কত সুন্দর সহজ সব উপদেশ দেওয়া হ'য়েছে—জীর্ণদেহকে ঠিক জীর্ণ-বাসের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে :

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী॥

গীতা-পাঠ শেষ হইলে, অরুণার শ্বাশুড়ী রাজীবকে বলিল,—"তোমার মুখে গীতার ব্যাখ্যা শুনে যে আজ কী শান্তি পেলাম, বাবা, তা' বোঝাতে পারবো না। ইচ্ছা হয় রোজ তোমার কাছে ব'সে কিছুক্ষণ গীতা শুনি। কিন্তু পরশুই আমাদের বাড়ী ফিরে যেতে হচ্ছে। আমাদের বৌমার কাছে তোমার সব পরিচয় পেয়েছি,—তুমি তো আমাদের নিজেদেরই লোক। আমার একটা কথা রাখবে, রাজীব? সময় ক'রে তুমি একবার আমাদের মহেশপুরে এসো না, বাবা? তোমার সঙ্গে অনেক বিষয়ে যুক্তি পরামর্শ ক'রবার আছে। কারণ বিরাট সংসার, তার ওপর ব্যবসা-পত্র চালানো। আমরা মেয়ে মানুষ, কিছুই ভেবে স্থির ক'রতে পারছি না। বিশ্বাসী ম্যানেজারটি ছিল ব'লেই কতকটা রক্ষে। কিন্তু তিনি একা কত-দিক সামলাবেন? দেবোত্তর সম্পত্তি ইত্যাদি দেখা-শোনা নিয়ে অনেক কাজ। তুমি সেখানে একবার গেলে সবই বুঝতে পারবে, রাজীব! আরও বিশেষ ক'রে তোমার একবার যাওয়া দরকার, কারণ বৌমা দেশে যে-সব কাজ আরম্ভ কোরতে চায়, তাতে তুমি সুদ্ধ যোগ দিয়ে যদি সব ব্যবস্থা কর, বাবা, তা হ'লে খুব ভাল হয়।"

রাজীব বলিল,—"এখন তো আমি কিছু ব'লতে পারছিনা, মা,

আমাদের সংঘের সভাপতি রুদ্রতেজকে জিজ্ঞাসা ক'রে পরে আপনাদের খবর দেবো। তবে আমার মনে হয়, এতে তাঁর অমত হবে না। যাই হোক, আপনারা মহেশপুরে গিয়ে আমাকে একটা চিঠি দেবেন, তারপর আমি যা হয়, একটা ব্যবস্থা কোরবো। তা হলে, আজকের ম'ত আমি আসি, মা।"—যাইবার সময় অরুণাকে রাজীব বলিল, "অরুণা, তুমি কাল্‌কে আর একবার আমাদের আশ্রমে যেও না, আমি রুদ্রতেজের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো,—মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। রুদ্রতেজ কালকে 'গীতা শিক্ষার প্রয়োজন কেন' সেই বিষয়ে একটা বক্তৃতা দেবেন।"

মহেশপুরে ফিরিয়া পরলোকগত রমণী মজুমদারের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শেষ করিতে অরুণাদের তিন-চার দিন কাটিয়া গেল। গরীব দুঃখী এবং অভাবগ্রস্তদের মধ্যে চাল-ডাল কাপড় ইত্যাদি বিতরণ ছাড়া শ্রাদ্ধে বিশেষ কোন আড়ম্বর অনুষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রাদ্ধের কাজ শেষ হইলে, অরুণা কাশীতে তাহার মাতার নিকট একটি পত্র লিখিল ঃ

"মা,

শ্রাদ্ধের কাজ নির্বিঘ্নে শেষ হ'য়ে গেল। ভেবেছিলাম—তুমি আসবে। কিন্তু তোমার পক্ষে শ্রাদ্ধে আসা যে একেবারেই অসম্ভব, তা' তুমি যতটা বুঝেছ, ততটা আমি বুঝতে পারিনি। তোমরা হয়তো আজ ভাবছো ভগবান কী নিষ্ঠুর!—তোমার একমাত্র মেয়ের অদৃষ্টেও আজ এই ঘটলো!

সধবা হ'য়ে, স্বামী নিয়ে সুখে-দুঃখে ঘর-কন্না তো অনেকেই করে না, কিন্তু ভগবান তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবার ভার ক'জনের উপর দেন? ক'জন ধনীর ধন-সম্পত্তির সদ্ব্যবহার হ'তে দেখা যায়? মহেশপুরের কত গরীব এবং মধ্যবিত্ত তাদের শেষ-সম্বলটি পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে পথে বসেছিল। আজ তা'রা ঋণমুক্ত হ'য়ে তাদের যার যা সম্পত্তি ফিরে পাচ্ছে, তাদের মনে আজ কত আনন্দ!

এতো লোকের আনন্দের কাছে, তোমার একটি মাত্র মেয়ের আনন্দ ও সুখ কি তুচ্ছ নয়? তা ছাড়া, সত্যি ক'রে আমার মনে তো কোন দুঃখই নেই, মা! বিয়ে ক'রে স্বামী-নিয়ে সুখে ঘর করবার তেমন ইচ্ছা

তো কোনদিনই আমার ছিল না। যে সংকল্প এবং আদর্শ সামনে উজ্জ্বল রেখে আমরা জীবনের পথে এগিয়ে চ'লতে চেয়েছিলাম, আমাদের সে-সব সংকল্প অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করবার এতো বড় সুযোগ যে ভগবান এনে দেবেন, তা কোনো দিন কল্পনাও ক'রতে পারিনি। আজ আমার চেয়ে বড় সৌভাগ্য ক'জনের? আমি আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী। ভগবান আমার ভিতর দিয়ে তাঁর যে-মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ ক'রতে চান তার সম্পূর্ণ সুযোগ আজ আমার সামনে উপস্থিত। আশীর্বাদ করো, মা, হৃদয়ে ভগবানকে জাগ্রত ভাবে উপলব্ধি ক'রে তাঁর কাজের যোগ্য ক'রে যেন নিজেকে গ'ড়ে তুলতে পারি।"

* * *

বহুদিন পরে কলিকাতায় হঠাৎ সেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজীবের সহিত অরুণার সাক্ষাৎ হওয়ায়, অরুণার প্রাণে নূতন ভাবে কত সব আশা জাগিয়া উঠিল। যে-সব ব্রত এবং মহৎ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার যে-সংকল্প একদিন তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, এইবার ভগবান তাহাদের সেই সংকল্প সিদ্ধ করিবেন, অরুণা যেন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল।

রাজীবের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর কলিকাতা ত্যাগের পূর্বে অরুণা আরও দুইদিন রাজীবের নিকট গিয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে সেদিন অরুণা তাহার অন্তরের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রাজীবকে বলিয়াছিল:

"রাজীবদা, তোমার বোধ হয় নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, দেশের কাজের জন্য, সমাজের সেবার জন্য একদিন তুমি এই অরুণাকে তোমার আদর্শ অনুযায়ী গ'ড়ে তুলতে আরম্ভ ক'রেছিলে। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে কি-একটা শক্তি এসে সব উল্টে দিয়ে গেল। প্রথমটা ভেবেছিলাম—সব বুঝি পণ্ড হ'য়ে গেল; জীবনটা কিছুদিনের জন্য একেবারে শূন্য হ'য়ে

গিয়েছিল। কিন্তু পরে ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম,—না, এই পরিবর্তনের পিছনে ভগবানের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য আছে। সে-উদ্দেশ্য আজ আমার সামনে সুস্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিয়েছে। মানুষের জীবনে কত সব অমঙ্গলের সৃষ্টি ক'রে, ভগবান কেমন ক'রে-যে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করেন, তা' আজ বেশ বুঝতে পারছি। সংসারের স্বার্থান্ধ জীব ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা বুঝতে না-পেরে ভগবানের উপর কতই না দোষারোপ করে।···কত বিপর্যয় এবং ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে দিয়ে ভগবান আজ আমাকে এমন এক অবস্থায় এনে ফেলেছেন যে, আমরা এখন অতি সহজেই আমাদের জীবনের সব উদ্দেশ্য কাজে লাগাতে পারবো। বিপুল ধন সম্পত্তি আজ-আমার অধিকারে এসেছে। ভগবান আবার যখন তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন, তখন আমি তোমার সাহায্য চাই, রাজীবদা',—তোমার পরিচালনায় আমি আমাদের দেশে আর মহেশপুরে কাজ আরম্ভ ক'রতে চাই। আমার শাশুড়ী তো সেদিন তোমাকে ব'ললেন, রাজীবদা', সুতরাং তুমি যত শিগ্‌গির পারো একবার মহেশপুরে চলো। কাজের প্রবর্তন আর বিধি-ব্যবস্থা যা' ক'রতে হয়, তুমিই ক'রবে, আমি কেবল সাথে সাথে থেকে, তোমার কাজে সাহায্য ক'রবো-মাত্র।"

রাজীব বলিল,—"তোমার কথা শুনে আমি আজ খুবই সন্তুষ্ট হ'লাম, অরুণা! জীবনের আদর্শ ভুলে না-গিয়ে, তাকে-যে আরও উজ্জ্বল ক'রে সামনে রেখেছ, তা' আমার পক্ষেও কম গৌরবের বিষয় নয়। কিন্তু, মহৎ কাজে-যে অনেক বাধা আছে, অরুণা! এ-পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে অনেক ভাবুক, অনেক দেশ-হিতৈষী বড় বড় সব মহৎ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রেছেন, কিন্তু পরিশেষে কি-যেন কোন্ শক্তির অভাবে, তাঁরা সব আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি আর ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা

চরিতার্থের দিকেই ঝুঁকে প'ড়েছেন। কাজ আরম্ভ ক'রে আমাদের পরিণতিও-যে সেরকম হবে না, তা কে ব'লতে পারে? তা'ছাড়া দেশের লোকের মনোবৃত্তি তো জানো? তোমাকে নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রতে গেলে নানা লোকে নানা সব গুজব রটাবে, অথচ আমাদের কাজ হবে— সেইসব লোকদেরই মঙ্গল সাধন করা। এ ছাড়া, তোমার আমার মধ্যে আমাদের পরস্পরের বিশ্বাসের প্রশ্নও ওঠে।"

রাজীবের এই কথায় অরুণা বলিয়া উঠিল,—"তুমি কি ব'লছো, রাজীবদা'! আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রতে পারবো না?—তোমার নিজের হাতে-গড়া অরুণাকে আজ তুমি এতো ছোট ক'রতে চাও? বুঝলাম— এ শুধু তুমি আমায় পরীক্ষা ক'রছো! কিন্তু এ-রকম ভাবে পরীক্ষা ক'রে কোন লাভ নেই,—কাজ আরম্ভ ক'রলে, তবেই সত্যকারের পরীক্ষা আরম্ভ হবে। তবে, হ্যাঁ, দেশের লোকের মনোবৃত্তির কথা ব'লছো, কিন্তু আমাদের কাজের পিছনে সত্যিকারের যদি আন্তরিকতা থাকে, আর আমাদের সব কাজের ফলাফল ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে, তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা যদি অকপট ভাবে কাজ ক'রে যাই, তবে লোকের কথা বা তাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা আমাদের কাজে কোন ব্যাঘাতই সৃষ্টি ক'রতে পারবে না।"

অরুণার এইরূপ উক্তিতে রাজীবের চোখ দুটি যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাজীব বলিল—"অরুণা, আমি তোমার কথায় বেশ বুঝতে পারছি—এতোদিন তোমার বৃথাই কাটেনি, তোমার মনের দৃঢ়তা এবং ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি তোমাকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারবো। তোমাদের ছেড়ে গিয়ে এই কয়েক বছর আমারও বৃথা যায়নি—ভগবান এমন সব যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন যে,

জীবনে আরও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হ'লো, এমন সব মহৎ লোকের সংস্পর্শে এলাম, যার ফলে জীবনের গতি এক নূতনতর পথের দিকে ফিরে গেল। আমাদের এই যে প্রতিষ্ঠান দেখছো, এর যোগাযোগ রয়েছে বর্তমান যুগোপযোগী এক অভিনব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। সেই প্রতিষ্ঠা-নের আদর্শে বাংলার প্রত্যেক জেলায় জেলায় আমরা শাখা-প্রতিষ্ঠান বা আশ্রম গ'ড়ে তুলতে চাই। আমাদের সংঘের নেতা একজন অতি আশ্চর্য লোক, তাঁর ক্ষমতা অতি অদ্ভুত! তাঁরই নির্দেশ ম'ত আমরা নানা রকমের কাজে হাত দিয়েছি; তার মধ্যে গীতার শিক্ষানুযায়ী জাতিকে গ'ড়ে তোলা হ'চ্ছে প্রধান। আমাদের সংকল্প অনুযায়ী সেই সব কাজের সফলতার জন্য তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা-সাক্ষাৎ, এ ভগবানেরই ইচ্ছা তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, অরুণা! আমি রুদ্রতেজের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, যত শিগ্‌গির সম্ভব, তোমাদের দেশে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রবো।"

* * *

রাজীবের কথায় ভরসা পাইয়া মহেশপুরে ফিরিয়া আসার পর অরুণা মনে যথেষ্ট উৎসাহ এবং আনন্দের সহিত তাহার শাশুড়ীর পরামর্শে এবং ম্যানেজারের সাহায্যে দেবোত্তর সম্পত্তি ও ব্যবসার হিসাবপত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করিল। অরুণার ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের এস্টেটের পুরাতন কর্মচারীবৃন্দের ভরণ-পোষণের জন্য তাহাদের প্রত্যেকের নামে কুড়ি বিঘা করিয়া ধানের জমি এবং ম্যানেজার, ক্যাসিয়ার ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে পাঁচ হাজার হইতে দশ হাজার পর্যন্ত টাকা দান করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল।

অরুণার উক্তরূপ ব্যবস্থায় এস্টেটের কর্মচারীরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল এবং তাহারা অধিকতর মনোযোগ এবং বিশ্বস্ততার সহিত নিজ নিজ

কর্তব্য পালন করিতে লাগিল। ইহার ফলে ক্রমশঃ এস্টেটের এবং ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি দেখা দিল, এবং বহুবিষয়ে অর্থের নানাপ্রকার অপচয়ও বন্ধ হইল।

অরুণা ইতিপূর্বেই বহু অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে তারিণী মজুমদারের নিকট হইতে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়াছে। এখন সে আরও অনুসন্ধান করিতে লাগিল—আত্মসম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন কোন মধ্যবিত্ত পরিবার ঋণ গ্রহণ করিয়া নিঃস্ব অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে কি না। সন্ধান পাইলে সেইসব ব্যক্তিদের বন্ধকী সম্পত্তি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিল।

অরুণার এইরূপ উদার এবং অচিন্ত্যনীয় ব্যবস্থায়, মহেশপুরের অধিবাসীরা অরুণাকে দেবীর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল, এবং সকলেই প্রাণ খুলিয়া ভগবানের নিকট অরুণার মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেশের অপর দুই চারিটি অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অরুণার উক্তরূপ কার্য-কলাপে বিভিন্নরূপ মত প্রকাশ করিল—কেহ বলিল, ইহা অত্যন্ত বাড়া-বাড়ি। কেহ বলিল, ঋণগ্রস্তদের সমস্ত সম্পত্তি একেবারে ফিরাইয়া না-দিয়া, সিকি বা অর্ধেক দিলেও চলিত—ইত্যাদি।

* * *

অরুণাদের এস্টেটের উক্তরূপ বিধি-ব্যবস্থা শেষ হওয়ার পর একদিন বৈকালে অরুণা তাহার শাশুড়ীর নিকট বসিয়া ভাগবতের কথা শুনিতেছে, এমন সময় বাড়ীর এক চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—"ভদ্রপুর হ'তে দাদাবাবু এসেছেন, সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোকও আছেন।" চাকরটির কথা শেষ হইতেই, বিরজার সহিত সৌরীন আসিয়া মন্দিরবাটীতে প্রবেশ করিল। সৌরীনকে দেখিয়া অরুণা বলিয়া উঠিল—"কি, দাদা-যে!—কোনো খবর দেওয়া নেই, হঠাৎ এসে হাজির?" সৌরীন বলিল—"খবর,

দেওয়ার সময় পেলাম কই,—গত-পরশু রাজীব ক'ল্‌কাতা হ'তে বাড়ী এসে র'য়েছে—তাকে নিয়ে আজই তোমাদের বাড়ী যেতে হবে।" অরুণা রাজীবের নাম শুনিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল—"কই রাজীবদা' কোথায়? আমরা রোজই তাঁর চিঠির অপেক্ষা ক'রছিলাম,—এই-যে, এসো রাজীবদা',—হঠাৎ এসে হাজির-যে?" অরুণার শাশুড়ীও রাজীবকে দেখিয়া বলিল—"এসো বাবা বোস, খবর সব ভাল তো?—কই, আসার আগে চিঠি দেবার কথা ছিল, কোনো খবর তো দিলে না?"

রাজীব উত্তর করিল—"না, মা, চিঠি দেওয়া আর হ'য়ে ওঠেনি, বাড়ী হ'তে খবর পেয়ে আমাকে হঠাৎ ভদ্রপুরে আসতে হ'য়েছিল, কাজেই সেখান হ'তে সৌরীনকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে চ'লে এলাম।"

"বেশ, বেশ, বাবা—ভালই ক'রেছ, সৌরীনও এসেছে, ভালই হ'য়েছে। যাও, জামা কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসো। বিরজা, যা, মা, শিগ্‌গির চায়ের জল চড়িয়ে দে-গে।"

বিরজাকে যাইতে দেখিয়া রাজীব বলিল—"ঘোড়া দুটো বাইরে বাঁধা আছে, সহিসকে ব'লে ওদের দানা-পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করুনগে দিদি।"—বিরজা যাইতে যাইতে, রাজীবকে বলিল—"দু'-পেয়ে ঘোড়া দু'টোর পেটে আগে দানা-পানি প'ড়ুক, তার পর চার-পেয়ে ঘোড়ার ব্যবস্থা হবে বৈ কি?"

* * *

অরুণার শ্বশুরালয়ে আসিয়া রাজীব দেখিল—বিরাট সংসার, বিশেষ করিয়া তাহাদের মন্দির-বাটী দেখিয়া রাজীব খুব সন্তুষ্ট হইল। মন্দিরে প্রত্যহ শতাধিক দরিদ্রকে পরিতোষপূর্বক প্রসাদ খাওয়ান হয়, তা' ছাড়া বহু মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে প্রত্যহ চাল তরি-তরকারী বিতরণ করিবার

ব্যবস্থাও অরুণা করিয়াছে। অরুণার এইসব ব্যবস্থায় রাজীব খুবই খুসি হইল। কিন্তু রাজীব অরুণাকে বলিল—"অন্ন-বস্ত্র দান বড় দান, সেবিষয়ে কারও কিছু ব'ল্‌বার নেই। কিন্তু জানো তো, অরুণা, স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাত্মজ্ঞান দানকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান ব'লেছেন। জাতিকে যেদিন অধ্যাত্মজ্ঞানে জাগিয়ে তুল্‌তে পারা যাবে, সেইদিন সব সমস্যার সত্যকারের সমাধান হবে। সেইজন্যই গীতার নির্দেশমত অধ্যাত্ম-শিক্ষাকে ভিত্তি ক'রে আমাদের সব কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে।... এইসব লোকেদের অকর্মণ্য রেখে যদি চিরদিন এদের ভরণ-পোষণ চালিয়ে যাও, তবে ভবিষ্যতে এদের দিয়ে সমাজের কোন মঙ্গলই হবে না। কাজেই অভাবগ্রস্ত আর নিষ্কর্মা লোকদের কোনো-না-কোনো কাজে লাগাতে হবে এবং তাদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার ফলে প্রত্যেক লোক যাতে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী অধ্যাত্মজ্ঞানে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে সে-বিষয়ে যথেষ্ট নজর দিতে হবে। অবিশ্যি এরকম শিক্ষা প্রচারে উপযুক্ত গুরু এবং কর্মীর দরকার। কিন্তু তারও অভাব হবে না, আমি তো তোমাকে ব'লেছি যে, আমাদের সংঘের নেতা একজন অতি অদ্ভুত ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ! জগতে এ-রকম মহামানব বড়-একটা দেখা যায় না। কিন্তু তিনিও তাঁর সাধনায় পূর্ণসিদ্ধি লাভের জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা ক'রেছেন, তবে আমাদের ভরসা দিয়েছেন—যেখানেই তিনি থাকুন, প্রয়োজনীয় সময়ে আমাদের খবর দেবেন। তাঁরই নির্দেশ এবং শিক্ষায় সংঘের অনেক সভ্য শিক্ষিত হ'য়ে উঠেছে এবং তাঁরই আদর্শে আমরা কাজ আরম্ভ ক'রেছি।

মহেশপুর এবং আমাদের ভদ্রপুরের মাঝামাঝি জায়গায় আমাদের সংঘের আদর্শে আমি একটা শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা ক'রতে চাই, আর তারই

সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে একটা সুগার মিল আর একটা কটন মিল গ'ড়ে তোলা যায়, সে-সম্বন্ধেও এখন হ'তে সমস্ত প্ল্যান ক'রে কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে। আমাদের পরিকল্পিত এই প্রতিষ্ঠানে যে-সব কর্মী এবং শ্রমিক কাজ ক'রবে, তাদের প্রত্যেকেরই নামে কিছু কিছু শেয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হবে। কাজেই প্রত্যেক কর্মীই হবে প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। এইরকম ব্যবস্থা করতে পারলে, মিলের উন্নতিও খুব শিগ্‌গির বেড়ে যাবে। এ-বিষয়ে তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।"

অরুণা বলিল—"আমার শাশুড়ীর এতে কোনই আপত্তি হবে না। তিনি আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। দেশের এবং জাতির উন্নতির জন্য আমার ইচ্ছাম'ত আমি এস্টেটের অর্থ কাজে লাগাতে পারবো। তুমি সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, রাজীবদা।"

১৯

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরম শত্রু এবং তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা ভীতির পাত্র সব্যসাচীর নিধন-সংবাদে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। তবু তাঁহারা সব্যসাচীর দলগত অপরাপর ব্যক্তির গতিবিধির উপর নজর রাখিতে ভুলেন নাই। কিন্তু দীর্ঘ সাত-আট বৎসর অতীত হওয়ার পর, যখন তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যে বিদ্রোহমূলক কোন কাজ আর সংঘটিত হইতে দেখিলেন না, তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অধিকতর নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া সব্যসাচীর উপদেশ মত 'পথের দাবী'র বিশ্বস্ত কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিরাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে,—বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি ছাড়া আরও বহু বিভাগ আছে, যথা—কৃষি, শিল্প, কলা এবং গ্রাম-উন্নয়ন বিভাগ। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সকল বিভাগের কাজ অতি নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন হইতেছে।

রেঙ্গুনের সেই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি আজ বৃহৎ আকারে পরিণত হইয়াছে; সেখানকার সকল দায়িত্ব ভারতীর!

সুমিত্রার স্মৃতিরক্ষা কল্পে সুরাবায়ায় সব্যসাচী যে মূল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গুরু অন্বেষণে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, সেই প্রতিষ্ঠানটি নিমাইবাবু, অচল, বিজন এবং শশীর কর্মকুশলতায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইয়া এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। সুরাবায়ার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ক্রমশঃ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দেশ দেশান্তর হইতে বহু ছাত্র শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্নস্থানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতেছে। 'পথের দাবী'র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত নিরলস, নিঃস্বার্থ এবং সর্ববিষয়ে অহংকারমুক্ত কর্মীদের ঐকান্তিক পরিশ্রম এবং চেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠানের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি ক্রমেই শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে।

রাজীবের চেষ্টায় এবং অরুণার অর্থে তাহাদের গ্রামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে, তাহা 'পথের দাবী'র সংঘভুক্ত না হইলেও 'পথের দাবী'র আদর্শেই সেখানকার শিক্ষাদি সমস্ত কাজ নির্বাহ হইতেছে, এবং 'পথের দাবী'র কলিকাতা শাখার সহিত তাহার যোগাযোগ আছে।

ইতিমধ্যে 'পথের দাবী'র কলিকাতার কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে :

কিছুদিন আগে, বিনোদবাবুর সহিত কি একটা বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য অপূর্বকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। বিনোদবাবুর বড় মেয়ে মাধুরী যখন জানিতে পারিল—রাজীব তাহার বাল্যসঙ্গিনী অরুণার সঙ্গে একযোগে সমাজ সেবা ইত্যাদি কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, রাজীবকে স্বামীরূপে লাভ করিবার তাহার আর কোনো আশাই নাই, তখন সে ভাবিল—"বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছাড়া নারীর জীবনে কি আর কিছুই করিবার নাই ?"—মাধুরী সম্পূর্ণরূপে স্থির করিয়া বসিল—সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে, তাহারই পন্থা অনুসরণ করিবে এবং যেমন করিয়া পারে সে তাহার জীবনকে গৌরবান্বিত এবং সুখী করিয়া তুলিবে। মনে এইরূপ দৃঢ় সংকল্প লইয়া একদিন মাধুরী অপূর্বর সহিত কলিকাতায় 'পথের

দাবী'র প্রতিষ্ঠানে বেড়াইতে গেল। মাধুরী সেখানে দেখিল—বহু নারী, প্রতিষ্ঠানের নানা বিভাগের কাজে যোগ দিয়াছে, কোন বিষয়ে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, সর্বদাই সকলে নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ; তাহাদের মনে কত উৎসাহ, কত আনন্দ এবং প্রত্যেকে সকল বিষয়ে কেমন শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া চলে। এইসব দেখিয়া মাধুরী সেদিন অপূর্বকে ধরিয়া বসিল—সেখানকার সংঘের নেতাকে বলিয়া তাহাকেও 'পথের দাবী'র সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে। অপূর্ব প্রথমে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু মাধুরীর জিদ এবং দৃঢ়তার জন্য অপূর্ব বিনোদবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া অবশেষে মাধুরীকে 'পথের দাবী'র সভ্য সংঘে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল। তদবধি মাধুরী 'পথের দাবী'র কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। মাধুরী অপূর্বর সহিত একবার রেঙ্গুনও গিয়াছিল, সেখানে ভারতীর কাছে থাকিয়া পথের দাবীর কাজ সম্বন্ধে সে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। রেঙ্গুন হইতে ফিরিয়া মাধুরী কলিকাতা কেন্দ্রে রুদ্রতেজের নির্দেশ ম'ত কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মাধুরীকে কাজে পাওয়ায় রাজীবের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কারণ মহেশপুর প্রতিষ্ঠানের কাজ লইয়া বেশীর ভাগ সময় রাজীবকে সেইখানেই থাকিতে হয়। রাজীবের সঙ্গে মাধুরী মহেশপুরেও একবার গিয়াছিল। সেখানে অরুণার সহিত পরিচয় হওয়ার পর, অরুণার ব্যবহারে এবং আদর-যত্নে মাধুরী বিস্মিত হইয়াছিল,—কী সে সহানুভূতি, প্রাণের সে কী আশ্চর্য দরদ ! এ-ধরণের দরদী-হৃদয় মাধুরী আর দেখে নাই। মাধুরীর প্রশংসা-বাক্যে সেদিন অরুণা মাধুরীকে বলিয়াছিল "প্রায় তিন বছর হ'ল আমার শাশুড়ী মারা গেছেন, তাঁকে তুমি যদি দেখতে, মাধুরী, তা' হ'লে অবাক হ'তে ! আমার মধ্যে যদি তুমি কোনো সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে থাক, তবে

জানবে—সে আমার শাশুড়ীরই দান। ও-রকম শাশুড়ী সংসারে কচিৎ দেখা যায়। কিন্তু এতো শিগ্‌গির তিনি আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন তা ভাবিনি। দেহ রাখবার কিছুদিন আগে একদিন তিনি আমায় ব'লেছিলেন—"বৌ-মা, আমি বোধ হয় তোমাদের মাঝে আর বেশীদিন থাকতে পারবো না; গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্যলীলায় যোগ দেবার জন্যে আমার ডাক এসেছে, আমাকে যেতে হবে।"

মাধুরী একমনে অরুণার কথা শুনিতেছিল। মাধুরী প্রশ্ন করিল—"তার পর?"

অরুণা বলিল—"যেদিন আমার শাশুড়ী দেহ রাখবেন সেদিন সকালে আমাদের ব'ল্‌লেন—রাধামাধবের পূজো সেদিন তিনি নিজেই করবেন। তাঁর নির্দেশ ম'ত সেদিন ঠাকুরের পূজো আর ভোগের যোগাড় অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই করা হ'ল। পূজো শেষ ক'রে তিনি নিজেই ঠাকুরের ভোগ দিলেন। ঠাকুরের ভোগ-রাগ শেষ হলে তিনি বল্‌লেন—আমাদের সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে প্রসাদ খাবেন। তাঁর ইচ্ছা ম'ত সেদিন সে-রকম ব্যবস্থাই করা হ'ল। আমাদের সকলের খাওয়া শেষ হ'লে আমায় তিনি বল্‌লেন—'বৌমা, আজ দুপুরে তোমরা আর কেউ শুয়ো-না, কাজ সেরে এসে তোমরা সবাই আমার কাছে বোসো; আমার শরীরটা তেমন ভালো বোধ হচ্ছে না, তুমি গীতাখানা নিয়ে এসে পড়ে আমাকে শোনাও।' শাশুড়ীর শরীর কোনও দিন একটু অসুস্থ হ'লেই তিনি গীতা কিম্বা ভাগবত প'ড়ে শোনাবার জন্যে আমায় বলতেন। সেদিন তাঁর নির্দেশ ম'ত একটা চওড়া বালিশ নিয়ে এসে তাঁকে দিলাম। তিনি বালিশে হেলান দিয়ে বসলেন। আমরাও সবাই তাঁর সামনে বসলাম। গীতার কোন্ শ্লোক শুনতে চান জিজ্ঞেস করায় তিনি আমায় অষ্টম অধ্যায়ের ৯।১০

শ্লোক পড়তে বলেই ধ্যানস্থ হলেন। আমি পড়লাম ঃ

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

"শ্লোকটা পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি—বালিশ হ'তে তাঁর মাথাটা ঢ'লে পড়লো। তাঁর ওরকম অবস্থা দেখে আমি আর বিরজাদি' তাঁর কাছে গিয়ে দু-জনে ধ'রে তাঁকে শুইয়ে দিলাম। কিন্তু আর কাকে শোয়ান? শোয়াবার আগেই তিনি মহাপ্রস্থান করেছেন। ব্যাপার বুঝতে পেরে বিরজাদি কেঁদে উঠলেন। আমি দিদিকে বল্লাম—'মা-র এ-মৃত্যু, সাধারণ মৃত্যু নয়, দিদি! তিনি সজ্ঞানে দেহ ছেড়ে অনন্তধামে গিয়েছেন। এ-জন্য আমাদের কাঁদা উচিৎ নয়—কান্নাকাটি করলে তাঁর আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হবে'।"

অরুণার কথা শুনিয়া সেদিন মাধুরী তো অবাক্! মাধুরীর শিক্ষা-দীক্ষা অন্যরূপ হইলেও, অরুণার কথাগুলি সে অবিশ্বাস করিতে পারে নাই। অরুণা মাধুরীকে তাহার শাশুড়ী সম্বন্ধে সেদিন আরও অনেক কথাই বলিয়াছিল। কাত্যায়নী দেবীর ইচ্ছানুযায়ী, তাহাদের মন্দির-সংলগ্ন বাগানের একস্থানে কাত্যায়নীর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করিয়া সমাধির উপর শ্বেতপাথরের এক বিরাট স্মৃতি-মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে। মন্দিরের উপরে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে—"দেবী কাত্যায়নী"।

মাধুরী দেখিয়াছিল, সমাধি-মন্দিরের ভিতরে কাত্যায়নী দেবীর একটি নিখুঁত প্রস্তর-মূর্তি স্থাপন করা হইয়াছে। মন্দিরের চতুর্দিকের আবহাওয়া এক গভীর প্রশান্তিতে পূর্ণ। মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রশস্ত নাট-মন্দিরও তৈয়ারি করা হইয়াছে; নাট-মন্দিরে নিয়মিতভাবে প্রত্যহ গীতা, চণ্ডী এবং ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। গ্রামের বালিকাদের বিনা খরচায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মন্দিরের পাশে নিকটেই একটি স্কুল-গৃহ নির্মাণ করিয়া নিয়মিত-ভাবে বালিকাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বালিকাদের ব্যায়াম শিক্ষার ভার অরুণা নিজেই গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া অরুণা গ্রামের দরিদ্র লোকদের চিকিৎসার জন্য বাগানের শেষে দক্ষিণ দিকে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

কাত্যায়নী দেবীর স্মৃতি-রক্ষার নিমিত্ত অরুণার এইসব ব্যবস্থায় মাধুরী যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছিল।

'পথের দাবী'র কলিকাতার শিক্ষাকেন্দ্রে আজ জয়ন্তী উৎসব। নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যান্য কেন্দ্র হইতেও 'পথের দাবী'র বিশিষ্ট কর্মীরা আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতী, অপূর্ব এবং অচলও আছে। উৎসবের প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর সংঘের নেতৃস্থানীয় সভ্যেরা হল-ঘরে একত্রিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছে। আলোচনার শেষে, সুযোগ বুঝিয়া বহুদিন পরে ভারতী আর একবার মাধুরীর সহিত রাজীবের বিবাহের প্রশ্ন তুলিল। কিন্তু ভারতীর কথায় মাধুরী বলিয়া উঠিল—"রাজীববাবু যদি বিয়ে করাতে সত্যিই মত দেন, তবে তাঁর অরুণা-দি'কেই বিয়ে করা উচিৎ, আর এতে কারও কোনো আপত্তি হওয়াও উচিৎ নয়। কারণ স্বাধীনভাবে জীবন-পথে চলবার অধিকার যেমন পুরুষদের আছে, তেমনি মেয়েদেরও আছে—মেয়েদের সে-দাবী 'পথের দাবী'র সভ্যদের স্বীকার করতেই হবে। কারণ 'পথের দাবী'র সভ্যদের ব্রতই হল—নারী পুরুষ সকলেরই এই পৃথিবীতে চলার পথের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।"

মাধুরীর কথা শেষ না-হইতেই রাজীব বলিল—"তোমার যুক্তির বিরুদ্ধে আমার বল্‌বার কিছুই নেই, মাধুরী, কিন্তু আবার নূতন ক'রে আমার বিবাহের প্রশ্ন একেবারেই উঠ্‌তে পারে না। বিবাহ করা না-করার অবস্থা আমাদের বহুদিন আগেই কেটে গিয়েছে। তা-ছাড়া এ-ধরণের কোনো সমাজ-বিপ্লবের কাজে পা বাড়ান 'পথের দাবী'র সভ্যদের

এখন ঠিক হবে না। তবে, সমাজে নারীর অধিকারের দাবী আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর সহিত এক সঙ্গে থাকা যদি অসম্ভব হয়ে ওঠে, তবে সেই স্ত্রীকে তার স্বামীর ঘরে থাকতেই হবে, সে-জুলুম আর চ'ল্‌বে না। পুরুষরা যদি স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে অন্য মেয়ে বিয়ে ক'রতে পারে, তবে স্ত্রীলোকেরাও তা' পারবে না কেন? তা' ছাড়া বাল-বিধবাদের ওপর এবং অপহৃতা বা লাঞ্ছিতা মেয়েদের ওপর সমাজের অমানুষিক অত্যাচার অবিচার আমাদের বন্ধ ক'রতেই হবে —"

রাজীব আরও কি-সব বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে সব্যসাচী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন! সব্যসাচীর এইরূপ আকস্মিক আবির্ভাবে সকলে অবাক হইল! কিন্তু প্রত্যেকের হৃদয় এক অপূর্ব আনন্দে নাচিয়া উঠিল। রুদ্রতেজ শশব্যস্তে হলঘরের মধ্যস্থলে একটি উচ্চ আসন আনিয়া দিলে, সব্যসাচী উপবেশন করিলেন।

দীর্ঘদিনের যোগ-সাধনায় সব্যসাচীর চেহারার আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে! বহু পূর্বে সুরাবায়ায় সুমিত্রার মৃত্যু-শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া, ভারতী সর্বপ্রথম সব্যসাচীর যে উজ্জ্বল মূর্তিটি দেখিয়াছিলেন, তাহা যেন আরও অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে; নির্লিপ্ত প্রশান্ত দৃষ্টি, এবং সমগ্র মুখমণ্ডল এক নূতন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত! সব্যসাচী আসন গ্রহণ করার পর রুদ্রতেজ বলিল,—"আজ আমাদের কী সৌভাগ্য, বিশেষ ক'রে আমাদের এই উৎসবের দিনে আপনাকে যে আজ আমরা এখানে পাবো, এ আমাদের আশার বাইরে।"

সব্যসাচী বলিলেন,—"কিন্তু আমার ভাল ভাবেই স্মরণ ছিল যে, আজকের তারিখে তোমাদের এখানকার কেন্দ্রের জয়ন্তী উৎসবের দিন। আমি আরও দু'দিন আগেই এসে পৌঁছতে পারতাম, কিন্তু গুরুদেবের

অনুমতি পেতে দেরী হ'য়ে গেল।...তোমাদের কি সব আলোচনা হ'চ্ছিল, শেষ ক'রে নাও।"

রুদ্রতেজ বলিল,—"আগে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করি।"

সব্যসাচী বলিলেন,—"না, প্রত্যেক দিনের নিয়ম ম'ত সন্ধ্যার আগেই আমার খাওয়া শেষ ক'রে নিয়েছি।"

রুদ্রতেজ বলিল, তা' আমরা শুনবো না—আজ কিন্তু আপনাকে আপনার নিয়ম ভাঙ্‌তেই হবে ; অন্ততঃ কিছু ফলও আপনাকে খেতে হবে। আমরাও এখনও কেউ রাত্রের খাওয়া শেষ করিনি, আপনার প্রসাদ গ্রহণ ক'রে তবে আমরা খাবো।"

সব্যসাচী হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তাই হবে, তোমরা তোমাদের আলোচনা আগে শেষ কর।"

রাজীব বলিল, "আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু বড় সমস্যার! ভারতী আবার ষড়যন্ত্র ক'রছেন, আমাকে বিয়েতে জড়াবার জন্যে। আর সেই সূত্রে সমাজে পুরুষের সহিত মেয়েদের সমান অধিকারের প্রশ্নও উঠেছে। ভাগ্যক্রমে এইসময় আপনি এসে প'ড়েছেন ; এখন এর শেষ-মীমাংসা আপনিই করুন।"

রাজীবের কথায় সব্যসাচী উত্তর করিলেন,—"নারীর মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে আমার নিজস্ব মত 'পথের দাবী'র পুরোণো সভ্যরা ভালই জানে। ও-বিষয় পরে আমি আরও অনেক ভেবেছি এবং এ-সত্য আমার কাছে আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে যে, নারী জাতিকে সমাজে সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা না-দিলে কোন দিনই 'পথের দাবী'র উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই হিন্দু সমাজকে ভেঙ্গে-চুরে নূতন ক'রে গড়ে তুলবার আজ দিন এসেছে।...বিধবা বিবাহ বা অবস্থা বিশেষে স্ত্রীলোকের একস্বামী বর্ত্তমানে অন্য স্বামী গ্রহণ,

এ-ব্যবস্থা তো হিন্দুশাস্ত্রেই আছে ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রের অনেক যুক্তি দেখিয়ে বহু পূর্বেই তা প্রমাণ ক'রে গিয়েছেন। পরাশর সংহিতা ব'লেছেন ঃ—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

এর অর্থ হ'চ্ছে—"স্বামী অনুদ্দেশ হ'লে মারা গেলে, ক্লীব স্থির হ'লে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ ক'রলে অথবা পতিত হ'লে, নারীদের পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত।"

কিন্তু হিন্দুসমাজের সব স্বার্থান্ধ পুরুষরা সমাজে মেয়েদেরকে সে সব ন্যায্য অধিকার হ'তে এখনও বঞ্চিত কোরে রেখেছে ! তাই নারীরা যাতে সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পায়, সে চেষ্টা আমাদের ক'রতেই হবে। কিন্তু বিবাহ ব্যাপারে 'পথের দাবী'র সভ্যদের জন্য ব্যবস্থা অন্যরূপ। আজ সেই কথা তোমাদের জানাবার জন্যই আমি আমার সাধনকেন্দ্র হ'তে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে এখানে এসেছি ! সমাজ-সংস্কার ক'রতে হবে সত্য, কিন্তু যতই সংস্কার করা যাক, যতদিন মানুষের জীবনের কেন্দ্র থাকবে অহং, ততদিন মানবজীবনে দ্বন্দ্ব ও অশান্তি কিছুতেই দূর হবে না। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব 'আমির ছাপটা তুলে দে' ব'লতে, স্বভাব এবং চেতনা হ'তে এই 'অহং' ভাবকেই নির্ম্মূল ক'রতে ব'লেছেন। কারণ অহংএর স্বভাবই হ'চ্ছে, দ্বন্দ্ব, পরকে আক্রমণ ক'রে, লুণ্ঠন ও গ্রাস ক'রে নিজেকেই বর্ধিত করা কিন্তু এই অহংই মানবের মূল-সত্তা নয়, এটা কেবল বাইরের খোলস ; ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশে একটা সাময়িক সংগঠন মাত্র, কারণ এই অহং-বৃত্তির বলেই জীব অতি ক্ষুদ্র অবস্থা হ'তে ক্রমে এই মানবরূপ মহান অবস্থায় এসে পৌচেছে ; অহংএর কাজ এইখানেই শেষ বলা যেতে পারে। আরও উর্দ্ধের চেতনা

লাভ ক'রতে হ'লে এই 'আমির সৌধকে' ধূলিসাৎ ক'রতেই হবে। আমি জানি তোমরা এই আমিত্ব-বর্জনের সাধনায় আংশিক সফলতা লাভ ক'রেছ, কিন্তু এই অহংএর পিছনে আমাদের প্রকৃত সত্তা যে আত্মা রয়েছে, যে-আত্মায় আমরা ভগবানের সঙ্গে এবং সর্বভূতের সঙ্গে এক এবং যে-আত্মা আপনার জ্যোতি, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম ও আনন্দে আপনাতে আপনি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ, সেই আত্মাকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার ক'রতে হবে। এইরূপ আবিষ্কারের ফলে আমরা প্রত্যেক মানুষ তথা প্রত্যেক জীবের মধ্যে সেই একই আত্মাকে দেখবো,—আপন-পর, স্বজাতি-বিজাতির ব্যবধান তখন ঘুচে যাবে। অহংএর পরিবর্তে সেই আত্মা যখন হবে আমাদের জীবনের ভিত্তি, সেই আত্মার জ্যোতি ও শক্তিতে আমাদের বাহ্য দেহ-মন-প্রাণ অবধি যখন দিব্য-জ্যোতিময় ও আনন্দময় হ'য়ে উঠবে, তখনই এই পৃথিবীর মাটিতে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা হবে এবং এই মানব-সমাজই দেব-সমাজে পরিণত হবে। আমার যে-উপলব্ধি সম্বন্ধে আমি বহু পূর্বে একবার তোমাদের আভাস দিয়েছিলাম, আজ তা আরও স্পষ্ট ক'রে আমি তোমাদের সামনে ব্যক্ত ক'রছি,—জগন্মাতা যুগ-যুগ ধ'রে মানুষকে যে অভাবনীয় দিব্য পরিণতির জন্য তৈরি ক'রে এসেছেন, তাঁর সে-ইচ্ছা যে আজ সুসিদ্ধ হবে, তার সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; সেই ভাগবতী-সংকল্প সিদ্ধির জন্য জগন্মাতা স্বয়ং এই পৃথিবীতে মানব-দেহে অবতীর্ণা হ'য়েছেন।"—

সকলে পুলকিত বিস্ময়ে সব্যসাচীর এই অপরূপ বাণী শ্রবণ করিতেছিল; কাহারাও মুখে একটিও কথা নাই। সব্যসাচী বলিতে লাগিলেন—"আমাদের সংসার নাই,—অতীতের সকল বন্ধন, সকল সম্বন্ধ, সকল সংস্কার নিঃশেষে বর্জন ক'রে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে জগন্মাতার হাতে সঁপে দিতে হবে, তবেই তিনি গ'ড়ে তুলবেন আমাদের দিব্য-জীবন। 'পথের দাবী'র

সভ্যগণের আজ আর বিবাহ করা নয়, বরং যারা বিবাহ ক'রেছে, তাদের মধ্যেও আর স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ থাকবে না—পিতা-পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী ইত্যাদি সব জাগতিক সম্বন্ধ আমাদের ত্যাগ ক'রতে হবে: আমরা সকলে হবো মহাশক্তির সংকল্প সাধনের সাধক ও সাধিকা, একমাত্র জগন্মাতার সন্তান; মায়ের চরণে একান্তভাবে সমর্পিত এইসব সন্তানদের নিয়েই মা জগদ্ধাত্রী গ'ড়ে তুলবেন নূতন সংঘ, নূতন সমাজ।"

* * *

অরুণার দাদা সৌরীন এবং তাহার মাতা সৌদামিনীর বিষয়ে এখানে কিছু বলিবার আছে: স্বামী-বিয়োগের পর, শোকাতুর অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে সৌদামিনীর প্রায় এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। বেনারসে পিত্রালয়ে অবস্থানকালে একদিন একটি ঘটনায় তাঁহার মনের অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীটি সৌদামিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"সংসারে নিজের কর্তব্যকে অবহেলা ক'রে এখানে তোমার ব'সে থাকা উচিত হ'চ্ছে না, মা! হৃদয়ের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে, বাড়ী ফিরে গিয়ে সেখানকার কাজ দেখ-গে; তোমাকে এবং তোমার ছেলে-মেয়েকে অবলম্বন ক'রে ভগবান তাঁর যে-মঙ্গল ইচ্ছা কাজে লাগাতে চান, সে-বিষয়ে সজাগ হওয়ার তোমাদের সময় এসেছে। তুমি অতি ভাগ্যবতী রমণী!" সন্ন্যাসীর কথায় সৌদামিনী মনে যেন এক নূতন শক্তি পাইলেন।

বেনারস হইতে নিজবাটী ভদ্রপুরে ফিরিয়া জমিদারী সংক্রান্ত কাজের বিষয়ে সৌদামিনী পুত্রকে যুক্তি-পরামর্শ দিতে লাগিলেন। দেশে সৌদামিনীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যথেষ্ট খ্যাতি আছে, এবং জমিদারী পরিচালনার দক্ষতায় তিনি তাঁহার স্বামীর সমকক্ষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রেবতীমোহন

মারা যাওয়ার পর, সাময়িকভাবে তাঁহাদের জমিদারীতে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সৌদামিনী ফিরিয়া আসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জমিদারীর সবত্রই একটা শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিলেন। এমন কি, রেবতী-মোহন নিজে যে-সব বিষয়ে নজর দেন নাই, সেই সব বিষয়ের দিকেও সৌদামিনীর দৃষ্টি পড়িল, এবং তাহার ফলে জমিদারীর আয়ও বাড়িয়া গেল। তবে প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সৌদামিনী বিশেষ নজর রাখিলেন; ইহাতে স্বার্থপর নায়েব-গোমস্তার অত্যাচারের কবল হইতে প্রজারা রক্ষা পাইল। সেজন্য সৌদামিনীকে কয়েকস্থানে উপযুক্ত লোকও নিযুক্ত করিতে হইল। এইরূপে জমিদারীর কাজ-কর্মের সুব্যবস্থা করিয়া, সৌদামিনী সম্প্রতি তাঁহার পুত্র সৌরীনের বিবাহ দিয়াছেন। সৌদামিনীর পুত্রবধূটি হইতেছেন 'পথের দাবী'র রুদ্রতেজের এক নিকট আত্মীয়া, নাম গীতা। গীতা তাহার পিতার একমাত্র কন্যা. পিতা মস্ত বড়লোক--- প্রকাণ্ড এক কোলি-য়ারীর মালিক। কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি মেয়ে জামাতার নামে সব সম্পত্তি লেখা-পড়া করিয়া দিয়াছেন। রুদ্রতেজের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে 'পথের দাবী'র সংঘ সম্বন্ধে গীতার জানা ছিল, এবং রুদ্রতেজের সহিত কলিকাতার শাখায় গিয়া সংঘের কর্মীদের কাজ-কর্ম দেখিয়া তাহার নিজেরও সংঘে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু পিতার কড়া নিষেধের জন্য গীতার সে-ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আসিয়া যখন সে দেখিল---তাহার ননদ অরুণা 'পথের দাবী'র একজন কর্মী এবং তাহার স্বাধীন ইচ্ছার তাহার মা এবং দাদা কোনো বাধার সৃষ্টি করে না, বরং তাহার কাজে তাঁহারা যথেষ্ট উৎসাহই দিয়া থাকেন, তখন গীতা খুবই আনন্দিত হইল। সৌরীন যখন তাহাদের কলিকাতার বাড়ীতে থাকিত, গীতাকে লইয়া সে প্রায়ই মোটরে

করিয়া 'পথের দাবী'র প্রতিষ্ঠানে গিয়া রুদ্রতেজের সহিত বহু বিষয়ে আলোচনা করিত।

জয়ন্তী-উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া অরুণা তাহার দাদা এবং বৌদি'কে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছে। রুদ্রতেজ ভারতীর সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপে খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছে।

জয়ন্তী-উৎসব শেষ হওয়ার পর অরুণা ভাঁড়ার ঘরে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া রাখার কাজে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ সব্যসাচীর আগমন সংবাদে সে-ও হল-ঘরে উপস্থিত হইয়া এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া সব্যসাচীর কথাগুলি একমনে শুনিতেছিল। সব্যসাচীর বক্তব্য শেষ হইতেই, অরুণা উঠিয়া গিয়া সব্যসাচীকে প্রণাম করিলে, রাজীব বলিল,—"এর কথাই আমি আপনাকে লিখেছিলাম, এরই নাম অরুণা।" অরুণা বলিল—"রাজীবদা'র কাছে আপনার কথা শোনার পর, একবার আপনার দর্শন পাওয়ার জন্য আমার মনটা যে সময়ে সময়ে কী চঞ্চল হ'য়ে উঠতো তা' আর কি বলবো!—আজ যে আমার কী সৌভাগ্য! আশীর্বাদ করুন, যে ব্রত জীবনে গ্রহণ ক'রেছি, আপনার পরিচালনায় থেকে যেন সেই ব্রত আমরা এই জীবনেই সফল ক'রে তুলতে পারি।"

অরুণার কথায় সব্যসাচী বলিলেন,—"তোমার পরিচয় রাজীবের চিঠিতে আমি সবই জানতে পেরেছি, অরুণা,—জগন্মাতার কাজের জন্য আজ আমাদের সংঘে তোমারই ম'ত সব মেয়েদের দরকার।"

রুদ্রতেজ বলিল,—"অরুণা, আজ রাত্রি হ'য়ে গেছে—শিগ্‌গির যাও, সব্যসাচীর জন্য এক গেলাস কমলালেবুর রস আর কিছু সন্দেশ নিয়ে এসো।"

রুদ্রতেজের নির্দেশে অরুণা তাড়াতাড়ি গিয়া কমলালেবুর রস এবং একটি থালায় কিছু ফল আর সন্দেশ লইয়া অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল। ভারতী অরুণার হাত হইতে থালা এবং গেলাস লইয়া সব্যসাচীর সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া একটু মৃদু হাসিয়া সব্যসাচীকে বলিল,—"দাদা, আগেকার সে-মূর্তি যেন ধ'রবেন না—প্রসাদ রাখতে হবে কিন্তু—মনে আছে তো, সেই শশী-তারা লজে খাওয়ার কথা ?"

ভারতীর কথায় সব্যসাচী হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—এখনও ভুলতে পার নি ?" পরে শশীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"শশী, বুঝতে পেরেছ ? ভারতী সেই তোমার বিয়ের ভোজ খাওয়ার কথা ব'লছে।" সব্যসাচীর কথায় শশীও হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—"বাবা, সে কী খাওয়া আপনার ! তা কি কেউ কখন ভুলতে পারে ?"···অতঃপর সব্যসাচী থালা হইতে একটি সন্দেশ তুলিয়া লইলেন এবং লেবুর রস পান করিয়া রুদ্রতেজকে বলিলেন—"যাও এবার তোমরা তোমাদের খাওয়া শেষ ক'রে নাওগে।"

অরুণা সকলকে সব্যসাচীর প্রসাদ বিতরণ করিল। আজ 'পথের দাবী'র সভ্যদের প্রাণে যে কী অপার আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত !

* * *

অচল সব্যসাচীর প্রতি অটুট বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাবশতঃ সব্যসাচীর নির্দেশ অনুযায়ী এতো দিন আন্তরিকতার সহিত সংঘের কাজ ক'রিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নিকট একটি বিষয় এখনও পরিষ্কার হয় নাই,—কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া জগৎ হইতে ধনতান্ত্রিকতার উচ্ছেদ-সাধন না-করিলে, পৃথিবীতে সকল মানুষের সমান

অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কি করিয়া সম্ভব? এ-প্রশ্ন অচলের মনে থাকিয়াই গিয়াছে—সুমিত্রা বা অরুণার মত হৃদয় জগতে কয়টি দেখা যায়?

পরের দিন প্রাতে সকলে একত্রিত হইলে, অচল সব্যসাচীকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, —"আচ্ছা, তা' হ'লে মার্ক্‌সের শিক্ষানুযায়ী বিপ্লবের আদর্শ কি আমাদের একেবারেই বাদ দিতে হবে?"

সব্যসাচী।—"মার্ক্‌সের আদর্শ বাদ দিতে আমি তো কোনো দিনই বলিনি। কিন্তু সেই আদর্শের সত্য রূপটি আমাদের গ্রহণ ক'রতে হবে এবং তা' কাজে লাগাতে হবে। মার্ক্‌স কি চেয়েছিলেন?—সমাজে কেউ শোষক বা শোষিত থাকবে না এবং কেউ বঞ্চিত থাকবে না—সকলে আপন আপন জীবন বিকাশের সমান অধিকার পাবে, পূর্ণ সুযোগ পাবে।—এই না?—এটা তো আমাদেরও আদর্শ। কিন্তু এর জন্য যে এক শ্রেণীর ওপর জোর-জবরদস্তি ক'রতেই হবে—মার্ক্‌সের এই নীতি মেনে নিতে আমরা রাজী নই। সমাজে ধনোৎপাদনে যারা সাহায্য ক'রছে, তারা যাতে সেই ধনের ন্যায্য অংশ পায়, মূলধনীরা তাতে স্বেচ্ছায় রাজী হ'লে, তাদের ওপরে আর জুলুমের প্রয়োজন কি? এ-রকম জুলুমের প্রয়োজন এক সময়ে যে ছিল না তা' আমি ব'লছি না। কারণ আমার জীবনের অতীত দিনের আমার সংকল্প এবং কার্য-কলাপ হ'তে তার পরিচয় তোমরা যথেষ্টই পেয়েছ! তা' নইলে ধনিক সম্প্রদায় শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার মেনে নেবার জন্য এ-ভাবে এগিয়ে আসতো না। কিন্তু কালের পরিবর্তনে জুলুমের দিন কি এখনও শেষ হবে না, অচল? মানুষ কি আজও সেই বর্বরের মত কামড়া-কামড়ি ক'রতে থাকবে?"

অচল।—"কিন্তু ধনিকদের আন্তরিকতার প্রতি আমার এখনও সন্দেহ আছে। তারা কি সহজে নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ ক'রতে রাজী হবে?"

সব্যসাচী।—"এতে তো তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না, তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে হ'লে শ্রমিকদের সাথে এ-রকম একটা ব্যবস্থা তাদের ক'রতেই হবে। ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মূলধনীরা তা' ক'রছেও —লভ্যাংশের বেশীর ভাগই তারা শ্রমিক আর সমাজের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজেদের রক্ষা ক'রছে।"

অচল।—"কিন্তু ক্যাপিটালিজম্ থাকলে, সেই সঙ্গে কি সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ ইত্যাদিও থেকে যাবে না?"

সব্যসাচী।—"সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ এ-সব কেবল মাত্র ক্যাপিটালিষ্টদেরই কাজ নয়, অচল! তোমাদের মার্ক্সবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্রাজ্য-বাদও ক্রমেই ভীষণ আকার ধারণ ক'রছে! এর মূল অনুসন্ধান ক'রতে হ'লে আমাদের আরও গভীরে যেতে হবে—মানব-চরিত্রের 'অহংবৃত্তি'ই হচ্ছে এর মূল কারণ, আমি তো তোমাদের ব'লেছি—একমাত্র আধ্যাত্মিকতার বিকাশে মানব-প্রকৃতি হ'তে যখন এই 'অহংভাব' দূর হবে তখনই পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে—আর সেইটাই আমাদের পথ, যা' ভারতের মুখ্য এবং সনাতন পন্থা। আজ সেই যুগ-যুগ ব্যাপী প্রয়াসের সফলতার দিন সমাগত—ভারতই জগতের জন্য এই বিজয় অর্জন ক'রবে;—তোমরা সেই মহান্ যুদ্ধেরই সৈনিক হও, এ-ই আমি চাই।"—

ভারতী বলিল,—"এর চেয়ে বড় গৌরব আর-কিছু আমরা কল্পনাই ক'রতে পারি না। আজ এটা আমরা বেশ ভাল ভাবেই উপলব্ধি ক'রছি যে, আধ্যাত্মিকতার দ্বারা ভিতরের একটা আমূল পরিবর্তন না-ক'রলে, বাহিরের রাজনৈতিক কিম্বা অর্থনৈতিক আন্দোলনে জগতে ঐক্য বা শান্তি কোনদিনই স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা হবে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করা কি সহজ ব্যাপার?—যোগী-ঋষিরা কত তপস্যা

কত সাধনা ক'রে যে-অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করে, সাধারণ মানুষের পক্ষে সমাজ-জীবনে কেমন ক'রে তা সম্ভব? আর সাধারণ মানুষের পরিবর্তন না-হ'লে, নূতন সমাজ, নূতন জাতি গ'ড়ে উঠবে কেমন ক'রে?"

সব্যসাচী।—"সেই প্রশ্নের সমাধানই তো এতদিনে পেয়েছি, ভারতী,—এই দীর্ঘদিন শ্রীগুরুর চরণতলে যাপন আমার বৃথাই যায়নি। তুমি ঠিকই ব'লেছ—দু'একজনের পরিবর্তন নয়, চাই মানব-প্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তন, রূপান্তর—যা' শুধু দু'একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, যা ক্রমশঃ ছড়িয়ে প'ড়বে সকলেরই মধ্যে। এ কিন্তু শুধু মানুষের চেষ্টাতেই সম্ভব হবে না—মানুষের কোনো উৎকট তপস্যা বা সাধনায় এ-অসম্ভব সম্ভব হ'তে পারে না;—ঊর্ধ্ব হ'তে এক ভাগবতী শক্তির অবতরণের ফলেই মানব-জাতির এই রূপান্তর সম্ভব হবে। প্রকৃতির প্রেরণায় পশু যেমন মানবে পরিণত হ'য়েছে তেমনই ভাগবতী শক্তির অবতরণের ফলে এই মানুষ অতিমানবে পরিণত হবে। একবার এ শক্তি পৃথিবীতে অবতীর্ণা হ'লে, সারা জগতে যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তাতে মানুষের পক্ষে অধ্যাত্ম-চেতনায় জেগে ওঠা সহজ ও সুগম হ'বে; এই ভাবেই ক্রমশঃ পৃথিবীতে অতিমানবের সৃষ্টি হবে।"

অপূর্ব বলিল,—"এই অতিমানবের আদর্শ বর্তমান জগতের সকল দেশেই মানুষকে যেন আকৃষ্ট ক'রছে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু আপনি যে-ভাবে এ তত্ত্বের ব্যাখ্যা ক'রলেন, এ রকম আর কোথাও শুনিনি। এটাই যে মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য, সে বিষয়ে আমার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে।"

অরুণা বলিয়া উঠিল,—"এ যে জলন্ত, জীবন্ত সত্য, অপূর্ববাবু! যে শুনবে তারই অন্তরাত্মা এতে সায় দেবে!"

সব্যসাচী।—"কিন্তু তোমার ম'ত সকলের অন্তরাত্মা তো জেগে ওঠেনি, অরুণা! সকলেই যে এই মহান আদর্শ এখনই গ্রহণ ক'রবে, সে ভরসা আমরা ক'রতে পারি না। তবে মানুষের মধ্যে এই জাগরণ যাতে ব্যাপকভাবে আসে—সেই চেষ্টা ক'রলেই পৃথিবীতে ভাগবতী শক্তির অবতরণে প্রকৃত সহায়তা ও সহযোগীতা করা হবে; আর বর্তমানে সেই-টিই আমাদের কাজ।"

রাজীব।—"আপনি বলুন, কি ভাবে আমরা কাজ আরম্ভ ক'রবো?"

সব্যসাচী বলিলেন,—"যেভাবে তোমরা কাজ আরম্ভ ক'রেছ, তা' ঠিকই হ'য়েছে—এইরকম কাজের মধ্য দিয়ে আরও নিখুঁতভাবে নিজেদের জীবনকে গ'ড়ে তোল। তখন তোমরাই এক একটি কেন্দ্র হ'য়ে সর্ব-সাধারণকে সাহায্য ক'রতে পারবে। যেরূপ শিক্ষাকেন্দ্র তোমরা স্থাপন ক'রেছ, ভারতে এবং ভারতের বাইরেও সর্বত্র এইরূপ কেন্দ্র স্থাপন ক'রতে হবে। এ-কাজ অতি বিরাট, কিন্তু মনে কোরো না যে এ কাজ আমরা ক'রছি বা আমাদেরই চেষ্টার ওপরে এর সাফল্য নির্ভর ক'রছে। ঊর্ধ্ব হ'তে ভাগবতী শক্তি কাজ ক'রে নিজের অবতরণের পথ নিজেই পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছে। এই ভাগবতী শক্তির ক্রিয়ার ফলে জগতের সর্বত্রই মানুষ আজ আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকছে—সর্বত্রই এমন লোক পাবে যারা সত্যই অধ্যাত্মসাধনা ক'রতে চায়, কিন্তু কেমন ক'রে তা করা যায়, কার কাছে যেতে হয়, কি প্রণালী অবলম্বন ক'রতে হয় তা অনেকেই জানে না; তাই অনেক সময়ে অযোগ্য লোক বা ভণ্ডের হাতে প'ড়ে অনেকের জীবন নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই আমাদের একটা প্রধান কাজ হবে—যাতে এইসব লোক অধ্যাত্মসাধনা ক'রবার সব রকম সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া। সাধারণ সাংসারিক-জীবনে থেকে অধ্যাত্ম-সাধনা হয় না,

গতানুগতিক ধর্মনীতি মেনে চ'ল্‌লে কতকটা আত্মতৃপ্তিলাভ ছাড়া আর কিছুই হয় না। প্রকৃত অধ্যাত্ম-সাধনা, যোগ-সাধনা ক'রতে হ'লে, সবকিছু ছেড়ে একান্তভাবে তাতেই ব্রতী হ'তে হয়। আমি জানি অনেক লোক এইভাবে সাধনা ক'রতে প্রস্তুত। যাতে এইসব লোক একটা আশ্রয় পায়—যেখানে থেকে তারা একান্তভাবে সাধনা ক'রতে পারে, এবং সাধন-পথে সবরকম সাহায্য পায় সেজন্য আমাদেরকে দেশের সর্বত্র যোগাশ্রম স্থাপন ক'রতে হবে। আপাতত তোমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকেই যোগাশ্রমে পরিবর্তিত ক'রে আরও ব্যাপকভাবে কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে। কিন্তু এই বিরাট কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন,—সুমিত্রার সম্পত্তির আয়ের ওপরে নির্ভর ক'রেই আমাদের এখন চ'লতে হ'চ্ছে—"

সব্যসাচীর কথা শেষ না-হইতেই অরুণা বলিয়া উঠিল, "আমার সমস্ত অর্থ আর সম্পত্তি আমি আপনার চরণে সঁপে দিচ্ছি, আপনি গ্রহণ করুন; আমি নিজের ব'লতে আর কিছুই রাখতে চাই না—সবই আপনি 'পথের দাবী'র কাজে লাগান।"

সব্যসাচী।—"এ তোমারই উপযুক্ত কথা, অরুণা, এতে আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। আমি জানি জগন্মাতার কাজের জন্য অর্থের অভাব আমাদের হবে না।"

সৌরীন এবং গীতাও সেখানে উপস্থিত ছিল। সব্যসাচীর কথা শেষ হইতেই সৌরীন সব্যসাচীকে বলিল—"আপনার এই মহৎ কাজের ভাগী আমরাও হ'তে চাই, সব্যসাচী! আমাদের কোলিয়ারীর আয়ের অর্ধেকই আমরা 'পথের দাবীর' কাজে উৎসর্গ ক'রছি, যখন যে-বিষয়ে আপনি দরকার মনে ক'রবেন, আমাদের টাকা আপনি কাজে লাগাতে পারবেন। এ-ছাড়া হঠাৎ কোনো বিষয়ে টাকার দরকার হ'লে আমাদের

জানাবেন, আমরা সর্বদাই 'পথের দাবীর' সেবার জন্য প্রস্তুত থাক্‌বো।"

সৌরীনের এইরূপ সংকল্পে উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হইল! রুদ্রতেজ বলিল—"আজ আমি সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য হ'চ্ছি, সব্যসাচী! ভগবান তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য কিভাবে যে সব যোগাযোগ ক'রে দেন তা আমরা আগে হ'তে কিছুই ধারণা ক'রতে পারি না। এই গীতা হ'চ্ছে আমার খুড়তুতো দিদির মেয়ে। আমাদের সংঘে যোগ দেবার জন্যে কত চেষ্টা ও কোরেছে, কিন্তু ওর বাবা কিছুতেই মত দেননি। কিন্তু, ভগবান চাকা ঘুরিয়ে দিলেন—ওকে এ-রকম স্বামীর হাত ধরিয়ে দিলেন যে, তার স্বামীর দ্বারাতেই আজ ওর কামনা পূর্ণ হ'ল।"

রাজীব বলিল,—"কিন্তু, শুধু টাকা হ'লেই তো চল্‌বে না? টাকায় না-হয় আশ্রম গড়া যাবে। কিন্তু প্রত্যেক আশ্রমে সাধকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত গুরু তো চাই? আমরা তো আপনাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না,—তা-ও আবার আপনি কখন-যে কোথায় উধাও হন, তার ঠিক নাই! আমরা তো কেবল সাধক মাত্র, নিজেরাই অন্ধ, তা অপরকে কি পথ দেখাবো?"

রাজীবের প্রশ্নে সব্যসাচী যেন কী, একটা নিশ্চিত ভরসায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"সে কাজের জন্য 'জগৎগুরু' অবতীর্ণ হ'য়েছেন, রাজীব! ভগবদ্‌ কৃপায় আমি তাঁরই আশ্রয় পেয়েছি।

"ভগবান তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পুণ্যভূমি ভারতে স্বয়ং মানব-আধারে জগৎগুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। ভগবানের এই অবতরণের উদ্দেশ্য এবং মহিমা জগদ্বাসী একদিন অবশ্যই জানতে পারবে, আর সেইদিনই এই পৃথিবীতে মানুষের চলার গতির মোড় ফিরবে।

"যাঁর আশ্রয় আমি পেয়েছি, তিনিই যে যুগাবতার জগদ্‌গুরু, আমার এ-বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নয়। তোমরা জান, যতদিন-না কোনো সত্য আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে ধরা পড়ে, ততদিন তাকে স্বীকার করা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। জগদ্‌গুরুর সংস্পর্শে আসার পর আমি যখন তাঁর গভীর জ্ঞান এবং বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পেলাম তখন তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভার কাছে আমার নিজের যত জ্ঞান আর প্রতিভা—যা' তোমাদের কাছে বিস্ময় ব'লে মনে হ'তো—একেবারে যেন ম্লান হ'য়ে গেল! রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি এবং আরও সব নানা-বিষয়ের নীতিজ্ঞান এবং বহু ভাষায় আমার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে তোমরা একদিন অবাক্ হ'য়েছিলে। কিন্তু জগদ্‌গুরুর সহিত তুলনায় আমার সে-সব জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য যে কত সামান্য তা' আমিই বুঝেছি; এ-সত্য আমি যত ভাল বুঝ্‌বো, অপর কারো পক্ষে সেরকম বোঝা বোধ হয় সম্ভব নয়। এই অত্যাশ্চর্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না-করলে সত্যের অমর্যাদা করা হ'বে। তবে কৃপণ এবং কপটের পক্ষে অপরের প্রতিভার মূল্য দেওয়া কষ্টকর হয়—তারা ভয় পায়, মানব-সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি পাছে শিথিল হ'য়ে যায়। কিন্তু প্রকৃত সত্য কখনো ঢাকা থাকে না—একদিন তা' প্রকাশ হ'য়ে পড়েই।

আমরা যদি কেবলমাত্র জগদ্‌গুরুর এই অপূর্ব সৃজনীশক্তি এবং বহুমুখী প্রতিভার দিকটাই বিচার করি তবে শুধু তাতেই বুঝতে পারি যে, আজ পর্যন্ত জগতে যত শ্রেষ্ঠ প্রতিভারই অভ্যুদয় হ'য়েছে, জগদ্‌গুরুর স্থান তাদের কত ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমি তাঁকে শুধু তাঁর এই বহির্বিকাশের মাহাত্ম্যেই বুঝিনি; আমি তাঁকে বুঝেছি আরও গভীরে—তাঁর নিজস্ব মহিমায় যেখানে তিনি অধিষ্ঠিত সেইখানে প্রবেশ ক'রে। এ শুধু তাঁর কৃপা। কারণ তিনি কৃপা ক'রে ধরা না-দিলে, তাঁকে ঠিক ম'ত বোঝা কারো

পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর দিব্য স্পর্শে যেদিন আমার দৃষ্টি খুলে গেল, আমার সব শিক্ষা-দীক্ষা এবং পাণ্ডিত্যের অভিমান যখন একেবারে ধুয়ে মুছে গেল আমি তখন বুঝতে পারলাম, এই জগতের সব মালিন্য, সব সংকীর্ণতা দূর ক'রে এই পৃথিবীর বুকে আনন্দের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রতে ভগবান স্বয়ং যুগাবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হ'তেই তিনি আমাকে ব'ললেন—'ঠিক সময়ে এসেছ'।"

সকলে অবাক হইয়া সব্যসাচীর বক্তব্য শুনিতেছে। সব্যসাচী বলিতে লাগিলেন—"এই দীর্ঘদিন তাঁর চরণতলে সাধনা করার পর তিনি আমায় ব'ললেন—'যাও, এইবার কাজ আরম্ভ করবার সময় হ'য়েছে।' গুরুদেব আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন—সাধকেরা যেখানেই তাঁর কাজ আরম্ভ ক'রবে, যোগশক্তির প্রভাবে তিনি প্রত্যেক সাধককে চালিত ক'রবেন। কিন্তু আমাদের হ'তে হবে তাঁর অনুগত কর্ম্মী—নিজস্ব কোন প্রকার ধারণা বা রুচি রাখা চ'ল্‌বে না। জগদ্বাসী আজ ধর্ম অধর্ম, কর্তব্য অকর্তব্য নিরূপণে বিভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়েছে—মানুষ মানুষকে বিশ্বাস ক'রতে পারছে না। যারা সত্যই এই পৃথিবীতে মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু ক'রতে চায়, তাদের আজ অর্জ্জুনের মত এই কথা বলে জগদ্‌গুরুর শরণ নেবার সময় এসেছে :—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

সব্যসাচীর কথা শেষ হইতেই রাজীব প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা, হিংসা অহিংসা সম্বন্ধে জগদ্‌গুরুর কি মত? যে-সব মহাত্মাগণ অহিংসার বাণী প্রচার ক'রছেন তাঁদের যুক্তি তো আমরা কিছুই বুঝতে পারি না।"

সব্যসাচী বলিলেন—হ্যাঁ, রাজীব, তোমার এই প্রশ্নই ছিল গুরুদেবের নিকট আমার সব প্রথম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব আমাকে তাঁর গীতার ব্যাখ্যা প'ড়তে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতার সৃষ্টি ক'রে মানুষের এই সমস্যার সমাধান বহু পূর্বেই ক'রে গিয়েছেন। কিন্তু গীতার শিক্ষাকে ঠিক ম'ত ধরা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। জগদ্‌গুরুর অভিনব ব্যাখ্যায় গীতার আসল রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। হিংসা অহিংসার সমন্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ব'লেছেন—নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন,...নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ। কারণ হিংসা অহিংসা হ'চ্ছে রজো এবং সত্ত্ব-গুণের ধর্ম। সুতরাং ভাগবতী-চেতনার সঙ্গে এক হ'তে হ'লে আমাদের ত্রিগুণাতীত হ'তে হবে, এবং ভাগবতী-সংকল্প সিদ্ধির জন্য ভাগবতী ইচ্ছায় যে-কোন কর্মে এমন কি 'ঘোর কর্মে'ও যদি লিপ্ত হ'তে হয়, তাতে বিমুখ হ'লে চ'লবে না—বড় বড় মহাত্মাদের ম'ত এ-কথা বলা চ'লবে না যে, ভগবান যুদ্ধ বা হত্যা চান না। নিজেদের মন-গড়া আদর্শকে আত্মার আদর্শ ব'লে প্রচার করা চ'লবে না। মনের নানান সব ধর্ম এবং যুক্তি হ'তে, এমন-কি মনের উচ্চ সাত্ত্বিক আদর্শ হ'তেও আমাদের বুদ্ধিকে সব সময়ের জন্য মুক্ত রাখতে হবে। তবেই আমরা গীতার এই শ্লোকটির তাৎপর্য বুঝতে পারবো :—

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

এই ভাবে সম্পূর্ণরূপে অহংমুক্ত হ'য়ে মা-ভগবতীর ইচ্ছার প্রতি একান্তভাবে সমর্পিত কর্মী প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারে যে, এই পৃথিবীর বুকে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সব বিরোধী-শক্তিকে ধ্বংস ক'রতে মহাশক্তি তাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার ক'রছেন মাত্র : 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব

নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচিন্' এই কথার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে যায়। ভাগবৎ কর্মীর দৃষ্টি যখন এইভাবে খুলে যায়, 'ঘোর কর্মে' নিযুক্ত হবার আদেশ এলে তখন আর সে আধ্যাত্মিকতার মুখোস প'রে অহিংসার বুলি আওড়ায় না—তখন অর্জ্জুনের ম'ত সে বলে :—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

সব্যসাচীর কথায় অচল বলিল—"অতো তলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা আমাদের এখনও হয়নি, সব্যসাচী, আমরা আপনার পথ এবং নির্দেশ মেনে চ'ল্‌বার জন্ত আমাদের জীবন উৎসর্গ ক'রেছি; আপনাকে ভিন্ন আমরা আর কাউকে এখনও জানি না। সুতরাং আমাদের আপনি যে-পথে যেমনভাবে চালাতে চান সেই ভাবেই নিয়ে চলুন।

উপস্থিত সকলেই একবাক্যে অচলের কথায় সায় দিল।

সব্যসাচী বলিলেন—"আমি সেইজন্তই তো জগদ্‌গুরুর নির্দেশ নিয়ে আবার তোমাদের মাঝে ফিরে এসেছি। কিন্তু মানব-সমাজের প্রতি জগদ্‌গুরুর বাণী আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। সে বাণী হ'চ্ছে :—

হে মানব! তোমরা নিজ নিজ প্রাণের স্বেচ্ছাচারিতা, মনের সকল প্রকার অহংকার এবং ব্যক্তিগত সব তুচ্ছ স্বার্থবুদ্ধির অতীত হও, মনে ও প্রাণে অটুট সমতা লাভ ক'রে, তোমাদের ব্যক্তিগত চেতনাকে বিশ্ব-চেতনার সহিত সংযুক্ত কর, এবং আরও উর্ধ্বের চেতনায় প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে নিজেদেরকে জগন্মাতার কর্ম সম্পাদনের যন্ত্রমাত্ররূপে একবার উপলব্ধি কর, তবেই তোমাদের দ্বারা আজ জগতের সকল সমস্যার সমাধান হবে, মানবের চলার **পথের দাবী** পূর্ণ হবে।"